Approved by the Calcutta University as a Text-Book

গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান
ও
গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যতত্ত্ব

স্বাস্থ্যের কথা, সরল স্বাস্থ্যপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

ডাঃ শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি.

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

বিহার ও উড়িষ্যার অবসর-প্রাপ্ত ডিরেক্টর অফ্ পাব্লিক্ হেল্‌থ

রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীজহরলাল দাস

কর্ত্তৃক সংশোধিত

এ. মুখার্জ্জী এণ্ড কোং

২, কলেজ স্কোয়ার : : কলিকাতা

প্রকাশকের কথা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যতত্ত্বের বর্ত্তমান সংস্করণটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইল। গ্রন্থখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত হইয়াছে এবং এই সংস্করণে বহু নূতন ছবি যোগ করিয়া অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় সহজ সরল ভাবে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি লেখা হইয়াছে। আশা করি গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে।

কাগজের দুর্ম্মূল্যতা হেতু বর্ত্তমান সংস্করণের মূল্য কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

—প্রকাশক

, ১৯৫৯

পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জ্জিত

নূতন সংস্করণ

অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ২, কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত ও নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ১নং মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান ও গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যতত্ত্ব

বিষয়-সূচী



গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান
ও
গার্হস্থ্য-স্বাস্থ্যতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

বাসগৃহ

অবস্থিতি

স্থান-নিরূপণ ও স্থান-সঙ্কুলন

মানুষ বন্য জীবজন্তুর মত ঘুরিয়া বেড়ায় না, তাহারা কোন না কোন স্থানে বাড়ীঘর তৈয়ার করিয়া বাস করে। অবশ্য মানুষের মধ্যেও কতক যাযাবর আছে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প। স্থায়ীভাবে কোথাও বাড়ীঘর তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

ভৌগোলিক দিক হইতে বিবেচনা করিয়া মানুষ তাহার বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য এরূপ একটি অঞ্চল বাছিয়া লয়, যেখানকার জলবায়ু, পথঘাট, উৎপন্নদ্রব্য প্রভৃতি তাহাদের জীবন-ধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন প্রকার অবস্থা অনুসারে তাহাদের জীবনযাত্রার প্রণালীকেও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। সেজন্যই দেখা

যায় যে এস্কিমোগণ তুন্দ্রা অঞ্চলে, বেদুইনগণ মরুভূমি অঞ্চলে এবং নিগ্রোগণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে বাস করে এবং এরূপ প্রত্যেক জাতির জীবনযাত্রার প্রণালী, ঘরবাড়ী, আহার, পোষাক, যাতায়াত ব্যবস্থা প্রভৃতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

উপরিলিখিত বিষয় বিবেচনা করিয়া মানুষ তাহার বাসস্থানের জন্য জায়গা নির্ব্বাচন করিবার পর আবার স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত বাড়ীঘর কোথায় কিভাবে নির্ম্মাণ করিবে তাহা স্থির করিয়া থাকে। কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকাকে কোন মানুষই পছন্দ করে না, সকলেই সুস্থ শরীরে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করিতে চায়। সেজন্য আমরা দেখিতে পাই যে জলাভূমি, শ্মশান প্রভৃতি যে সকল স্থানের স্বাস্থ্য অত্যন্ত খারাপ, কোন লোকই তথায় বাস করে না। অপর পক্ষে নদী বা পুকুরের ধারে, পাহাড়ের গায়ে বা খোলা মাঠের পাশে যেখানে নির্ম্মল বায়ু ও প্রচুর সূর্য্যালোক পাওয়া যায়, অর্থাৎ যেখানকার স্বাস্থ্য ভাল সেখানেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বাড়ী তৈয়ার করা হয়। সে জন্যই মানুষ তাহার বাড়ী তৈয়ার করিবার সময়ে অন্যান্য বিষয়ের সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া থাকে।

স্থান নিরূপণ—কোন জলাভূমিতে, অথবা অন্ধকার বনের মধ্যভাগে কিংবা যেখানে কিছুতেই আলো-বাতাস পাওয়া যায় না, সর্ব্বদা স্যাঁৎসেতে থাকে বা পচা দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, এরূপ স্থানে নানাপ্রকার রোগের বীজাণু জলে, মাটীতে বা বাতাসের মধ্যে সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। সুতরাং ঐ সকল স্থানে বাড়ী

তৈয়ার করিয়া বাস করিলে সুস্থ লোকেরও সহজেই নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে। ঐরূপ অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার অন্যান্য নিয়ম পালন করা সত্ত্বেও রোগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা কষ্টকর। সেজন্যই বাড়ীঘর তৈয়ার করিবার সময় সর্ব্বপ্রথমে উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করা প্রয়োজন।

স্থান নিরূপণের জন্য এসকল বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন :—

১. উচ্চতা ও ভূমির ঢাল—যেখানে বাড়ী তৈয়ার করা হইবে তাহা চারিদিকের স্থানসমূহ হইতে উঁচু হওয়া প্রয়োজন এবং সেখান হইতে চারিদিকে ঢালু হইয়া যাইবে। অবশ্য কোনও একদিকে ঢালু বেশী হইয়া সেখানকার জল খাল বা নদীতে গিয়া পড়িলে তাহা আরও ভাল হয়। এরূপ অবস্থার ফলে বাড়ীতে জল জমিয়া থাকিতে পারিবে না, তাহা আপনা হইতেই গড়াইয়া চারিদিকে চলিয়া যাইবে। অপর পক্ষে, বাড়ীর জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান চারিদিক অপেক্ষা নীচু হইলে চারিদিকের জল আসিয়া তথায় জমা হইয়া ঐ স্থানটিকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে।

২. ভূমি—যে ভূমির উপর বাড়ী তৈয়ার হইবে, তাহা ছিদ্রযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে জল মাটীর ভিতর দিয়া চোয়াইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু এঁটেল বা শক্ত মাটী হইলে জল সহজে নামিতে পারে না এবং কালক্রমে তথায় জল দাঁড়াইয়া গিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

৩. ভূগর্ভস্থ জল (Subsoil water)—মাটীর উপর দিয়া যেরূপ জল গড়াইয়া যায় সেরূপ মৃত্তিকার ভিতর দিয়াও জল এক স্থান হইতে

অন্যত্র প্রবাহিত হয়। অনেক সময় কোনও খাল, পুকুর প্রভৃতি ভরাট করিয়া তাহার উপর বাড়ী তৈয়ার করা হয়। এরূপ ব্যবস্থার ফলে কিছু কাল পরে তথায় ভূমি স্যাঁৎসেতে হয়, এমন কি জলও দাঁড়াইয়া যায়। সুতরাং বাড়ী তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে এ সকল বিষয়ে খোঁজ লওয়াও একান্ত দরকার।

৪. চতুষ্পার্শ্ব—বাড়ী তৈয়ার করিবার জন্য তাহার চারিদিকের অবস্থা ভাল ভাবে লক্ষ্য করা দরকার। শ্মশান, কবর, আস্তাকুঁড়, কল-কারখানা প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অসংখ্য ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায় এবং নানাপ্রকার দুর্গন্ধ থাকে। উহাদের সহিত রোগের বীজাণু মিশ্রিত থাকে বলিয়া ঐ সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের স্বাস্থ্যও খারাপ। সেজন্য ঐরূপ দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্ত স্থান হইতে দূরে বাড়ী তৈয়ার করিবার স্থান নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন।

বাড়ীর নিকটে গভীর বন, ঝোপ, জঙ্গল, জলাভূমি প্রভৃতি থাকিলেও স্বাস্থ্য খারাপ হয়। ঐ সকল স্থান যে কেবল স্যাঁৎসেতে থাকে, তাহা নহে। ঐ সকল গাছপালা হইতে রাত্রিতে দূষিত বাষ্প বাহির হয় এবং তাহার ফলে নিকটবর্ত্তী স্থানের বায়ুও দূষিত হয়। এজন্যই রাত্রিকালে বনে বা বাগানে যাওয়া নিষিদ্ধ।

(৫) স্থান সঙ্কুলান—বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় বাড়ীতে কত জন লোক বাস করিবে তাহা জানা দরকার। বাড়ীর নিয়মিত বাসিন্দা ব্যতীত দাসদাসী, অতিথি প্রভৃতির এবং গৃহপালিত পশু,

পক্ষীর জন্যও প্রয়োজনীয় জায়গার হিসাব করা দরকার। ইহাদের উপযোগী বাসগৃহ বা থাকিবার ঘর ছাড়াও বসিবার ঘর, পড়ার ঘর, রান্নাঘর, ভাঁড়ার, আস্তাকুঁড়, পায়খানা, স্নানের ঘর প্রভৃতির জন্য পৃথক পৃথক জায়গায় হিসাব করা দরকার। কোন কোন বাড়ীতে রোগীর জন্য আলাদা ঘর (segregation room) রাখা হয়।

উপরিলিখিত বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়া বাড়ী তৈয়ার করা উচিত। সেজন্য বাড়ী করিবার পূর্ব্বেই কতগুলি ঘর হইবে, তাহাদের কোন্‌টির কিরূপ মাপ হইবে এবং কোন্ ঘরের কোন্‌দিকে অপর কোন্ ঘর হইবে ইত্যাদি হিসাব করিয়া নক্সা তৈয়ার করা দরকার। পাকা বাড়ীতে এসকল ঘর পাশাপাশি বা উপরে উপরে হইতে পারে। কিন্তু কাঁচা বাড়ীতে শয়ন ঘর হইতে পায়খানা বহু দূরে থাকা প্রয়োজন। অবশ্য গোশালা বা অন্যান্য পশুর ঘর সকল অবস্থায়ই দূরে তৈয়ার করা উচিত। কোন প্রকারে দুইটি কোঠার বা ঘরের মাঝখানে আলো-বাতাসহীন স্থানে আর একটি ঘরের ব্যবস্থা করিলে হয়ত স্থান সঙ্কুলানের সুবিধা হয়, কিন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সেজন্য ঐভাবে ঘর তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে ভাল ভাবে নক্সা করিয়া তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল কিনা বিবেচনা করিয়া পরে বাড়ী তৈয়ার করা উচিত। সিনেমা, থিয়েটার, সভাসমিতি প্রভৃতিতে বহুলোকের সমাগম হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যের উপযোগী ব্যবস্থাসমূহ যথারীতি

পালন করা সম্ভবপর হয় না। এসকল কারণে ঐ সকল স্থানে অতিরিক্ত গমনের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে, ঐ সকল স্থানে কেহ স্থায়ীভাবে বাস করে না বলিয়া ততটা অনিষ্ট হয় না। সেজন্যই বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় ঐরূপ বিপজ্জনক অবস্থার বা অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি যাহাতে না হয়, সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যক।

প্রচুর বায়ু ও সূর্য্যালোক

বাড়ী তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্যে ভূমির ঢাল, জলনিকাশের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় লক্ষ্য রাখা যেরূপ দরকার, তাহার চতুষ্পার্শ্বের প্রতি তাহা অপেক্ষা কম লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। কারণ, বায়ুপ্রবাহ ও সূর্য্যালোক বাড়ীর চারিদিকের অবস্থার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। কোন বাড়ীর চারিপাশে ঘন গাছপালা বা বন থাকিলে নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহের এবং সূর্য্যালোকের প্রবেশের পথে বিশেষ বাধা হয়। সুতরাং ঐরূপ বাধা সর্ব্বপ্রকারে দূর করিতে হইবে, কারণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ঐ দুইটি উপাদান অতীব প্রয়োজনীয়। বায়ু-প্রবাহ কেবল যে দূষিত বা দুর্গন্ধযুক্ত স্থানের বিশোধনের জন্য দরকার তাহা নহে, উহার উপর আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা প্রণালীও বিশেষভাবে নির্ভর করে। সূর্য্যালোকও আমাদের জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং বায়ু ও সূর্য্যালোকের অবাধগতির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

এই জন্যই বাড়ী তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে সকল দিক বিবেচনা করিয়া নক্সা তৈয়ার করা উচিত। ঘরের চারিদিকে কিছু-দূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত প্রান্তর বা খোলা মাঠ থাকা দরকার। এরূপ উন্মুক্ত স্থানকে (compound) কম্পাউণ্ড বলা হয়। এরূপ স্থানে ঘন গাছপালা জন্মিলে যেমন বায়ু ও সূর্য্যালোকের প্রবেশের পথে বিঘ্ন হইবে, সেরূপ ভূমির আর্দ্রতা বা শুষ্কতাকেও অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া স্থানটিকে আরও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিবে। বাড়ীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিক হইতে সূর্য্যালোক ও বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় এবং সেইজন্যই ঐ দুই দিক সর্ব্বদাই পরিষ্কার রাখিবে। আবার চারিদিকে বহুদূর পর্য্যন্ত গাছপালা না থাকিলে যেমন সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়, তেমনই স্বাস্থ্যের পক্ষে কতক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রৌদ্রের সময় ঐরূপ বাড়ীতে ভয়ানক গরম বোধ হয়। সেজন্য বাড়ীর উত্তর ও পশ্চিমদিকে কিছুদূরে ইউক্যালিপটাস, নিম, দেবদারু, বেল, ঝাউ, পাইন প্রভৃতি গাছ ; বা কয়েকটি আম, কাঁঠাল গাছ রোপণ করা যাইতে পারে। ইহাতে বাড়ীতে ছায়া হয় এবং ভূমির শুষ্কতাও কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। নিকটে কোন স্যাঁৎসেতে জায়গা থাকিলে তথায়ও কয়েকটি ঐ প্রকার বড় গাছ রোপণ করিলে ভূমি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ হইয়া থাকে।

সূর্য্যালোক ও স্বাস্থ্য

সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তুর জীবনযাত্রার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাদের অভাবে

কাহারও জন্ম বা বৃদ্ধি সম্ভবপর হয় না। এই আলোক ও উত্তাপ দ্বারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধিত হয়।

উদ্ভিজ্জ প্রভৃতির জন্ম—যে কোন প্রকার বীজ হইতে অঙ্কুর বাহির হইবার পক্ষে সূর্য্যালোক প্রয়োজন। উহার অভাবে বীজ অঙ্কুরিত হয় না, বা হইলেও বাঁচে না।

উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি—বৃক্ষলতাদি সূর্য্যালোক লাভ করিলেই উহাদের পাতার সবুজ রঙ্ হয় এবং উহারা অক্সিজেন বাষ্প ত্যাগ করে এবং কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প গ্রহণ করে। অপরদিকে মানুষ ঐ অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিয়া উপকৃত হয় এবং তাহাদের প্রশ্বাস হইতে যে দূষিত কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প নির্গত হয় তাহা দ্বারা তাহাদের আর কোন প্রকার অনিষ্ট হওয়ার ভয় থাকে না।

1. মানবদেহের শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্য—সূর্য্যালোক দ্বারা মানুষের অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং অপর দূষিত বাষ্পসমূহ ত্যাগ করিবার পক্ষে সাহায্য করে।

2. মানবদেহের কার্য্যক্ষমতা বৃদ্ধি—সূর্য্যালোক দ্বারা মানুষ অধিকতর কর্ম্মশক্তি লাভ করে, অবশ্য প্রখর রৌদ্রে কার্য্য করা সকল অবস্থাতেই সুকঠিন এবং ঐরূপ অবস্থা আলস্যকে প্রশ্রয় দান করে।

3. মানবদেহের রোগনিবারক—সূর্য্যালোকে যে আল্ট্রাভায়লেট্ রশ্মি (Ultraviolet rays) থাকে তাহা দ্বারা শরীর গঠনের সাহায্য হয় এবং চর্ম্মরোগ, অস্থি (শীর্ণ বা বাঁকা হওয়া প্রভৃতি) রোগ (rickets) আরোগ্য হয়। সেজন্য উষ্ণমণ্ডলে ঐ সকল রোগ

কম দেখা যায়, কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ঐ সকল রোগ অধিক বিস্তার লাভ করে।

৫. দূষিত জিনিষ ও রোগের জীবাণু নাশ—প্রবল সূর্য্যালোক দ্বারা বহু প্রকার রোগের জীবাণু এবং দুর্গন্ধ প্রভৃতি অতি অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ ব্যবস্থা ঔষধের মত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ উপকারী। ইহা দ্বারা কেবল যে বায়ুমণ্ডলের রোগ বীজাণু নষ্ট হয় তাহা নহে, জলের মধ্যস্থিত বীজাণুও নষ্ট হয়। সেজন্যই পুকুর, নদী প্রভৃতিতে প্রচুর সূর্য্যালোক পতিত হইলে তাহাদের জল স্বাস্থ্যকর হয়। সেজন্য বাড়ীতে পুকুর, কূপ প্রভৃতি উন্মুক্ত স্থানে তৈয়ার করা উচিত এবং যাহাতে সর্ব্বদা তাহাতে সূর্য্যের উত্তাপ ও আলোক পাওয়া যায় সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

বাড়ী তৈয়ার করিবার সময় উপরিলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে সেই বাড়ীর স্বাস্থ্য ভাল হইবে বলিয়া সহজেই আশা করা যায়। অবশ্য কেবল মাত্র ঐ সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই স্বাস্থ্য-রক্ষা হয় না। সেজন্য ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করাও দরকার। সে বিষয় পরে লিখিত হইবে।

বায়ু ও বায়ু-চলাচল

সকল প্রকার জীবজন্তু এবং উদ্ভিদের জীবন ধারণের জন্য বায়ুর এতই প্রয়োজন যে, বায়ুর অভাব হইলে বা কোথায়ও বায়ু দূষিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। জল এবং খাদ্যও

মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে বিশেষ দরকারী, কিন্তু বায়ুর মত কোনটিই নহে। কারণ, অপরগুলির অভাব আমরা কিছু কাল সহ্য করিতে পারি, কিন্তু বায়ুর অভাব দুই মিনিটও সহ্য করা যায় না।

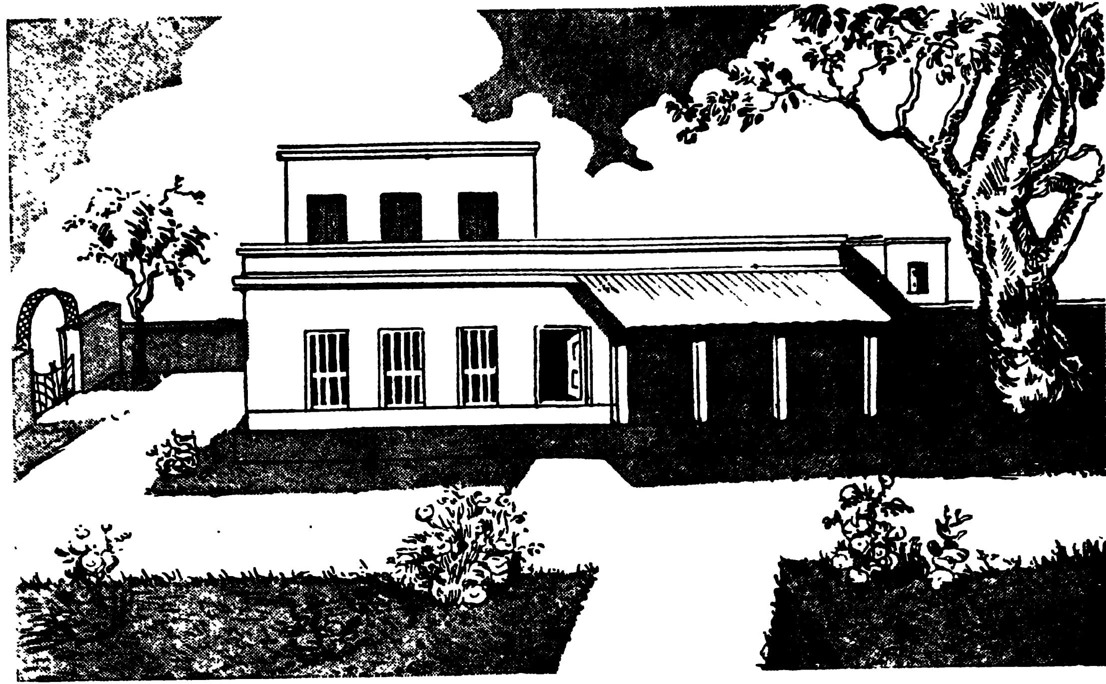
বায়ুর উপাদান

যে বায়ু আমাদের সকলের পক্ষে এতই প্রয়োজনীয় তাহা কি? উহা কোনও একটি মৌলিক পদার্থ (element) নহে; বরং কতকগুলি বায়বীয় পদার্থের সমষ্টি। সেজন্য বায়ুর উপাদান সর্ব্বত্র এবং সকল সময়ে সমান থাকে না। বিভিন্ন স্থানে—এমন কি, একই স্থানে বিভিন্ন সময়ে বায়ুর উপাদানের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি তাহা নিঃশ্বাস বায়ুরূপে যাহা আমরা ত্যাগ করি তাহা অপেক্ষা পৃথক্। ঐ দুই অবস্থার মধ্যে অক্সিজেন ও কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণের পার্থক্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে।

যাহা হউক, বিশুদ্ধ বায়ু নিম্নলিখিত তিনটি উপাদান দ্বারা গঠিত।

(ক) অক্সিজেন (Oxygen)—	শতকরা ২০.৯৬ ভাগ
(খ) নাইট্রোজেন (Nitrogen)—	৭৯.০০ ”
(গ) কার্ব্বনিক এসিড (Carbonic Acid)—”	০.০৪ ”
	মোট—১০০.০০ ভাগ

উপরিলিখিত তিনটি বাষ্পই বায়ুর শতকরা প্রায় ১০০ ভাগ



স্বাস্থ্যকর উদ্যানসংলগ্ন গৃহ

পৃঃ ১০

হইলেও উহার মধ্যে অন্যান্য কিছু কিছু উপাদান থাকে। ঐ সকল উপাদানের পরিমাণ খুব সামান্য হইলেও উহারা একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন অবস্থায় সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া থাকে। ঐ সকল উপাদানের মধ্যে (ঘ) জলীয় বাষ্প (Water vapour), (ঙ) এমোনিয়া (Ammonia), (চ) ওজোন (Ozone), (ছ) হাইড্রোজেন (Hydrogen), (জ) আরগণ (Argon), (ঝ) নিয়ন (Neon), (ঞ) হিলিয়াম (Helium), (ট) জেনন (Zenon), (ঠ) ক্রিপটন (Cripton) প্রভৃতি বাষ্প থাকে; তা-ছাড়া (ড) ধূলা, বালি, ধোঁয়া এবং (ঢ) ভূষার কণা, পাট, তূলা প্রভৃতির আঁইস ও (ণ) Bacteria থাকে। এই সকল উপাদানের কোন কোনটি খুব সামান্য পরিমাণে বাড়িলেই বায়ু লোকের পক্ষে অতিশয় অনিষ্টকর হইয়া থাকে।

অক্সিজেন ও কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি বাষ্পের সহজ পরীক্ষা

(ক) **অক্সিজেন** বা অম্লজান—বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারী। ইহার অভাবে আমরা কিছুতেই বাঁচিতে পারি না, অপর পক্ষে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকেও বিশুদ্ধ অক্সিজেন বাষ্প দিলে, তাহার জীবনী শক্তি অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা বহু পরিমাণে কমিয়া থাকে। আমরা প্রশ্বাসের সহিত যে পরিমাণে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করি,

নিঃশ্বাসের সহিত তাহা অপেক্ষা কম অক্সিজেন বাষ্প আমাদের শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে। তবে মোটের উপর বায়ুর ⅕ অংশ উপাদান এই একটি মাত্র বাষ্প হইতে পাওয়া যায়। এই অক্সিজেন বাষ্প আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া মৃদু দহন কার্য্য করিয়া থাকে। তাহার ফলে শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং তাহা দ্বারাই আমরা কাজ করিবার শক্তি, উৎসাহ, আনন্দ ও স্বাস্থ্য লাভ করি। কিন্তু উপকারী বাষ্পের পরিমাণ অধিক হইলে শরীরের উত্তাপ বেশী হয় এবং তাহার ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এই বাষ্পের স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধ নাই।

কোন স্থানে অক্সিজেন বাষ্প আছে কি না তাহা আলো জ্বালিয়া সহজেই পরীক্ষা করা যায়। আলো যদি সহজেই জ্বলে তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, তথায় ঐ বাষ্প উপযুক্ত পরিমাণে আছে, আর আলো না জ্বলিলে বা জ্বলিবামাত্র নিবিয়া গেলে ঐ বাষ্পের অভাব বুঝাইবে। প্রমাণ স্বরূপ, একটি আলো (প্রদীপ) জ্বালাইয়া তাহাকে একটি কাচের পাত্র (বেলজার) দ্বারা ঢাকিয়া রাখিলে ঐ পাত্রের মধ্যে যতক্ষণ অক্সিজেন বাষ্প থাকিবে ততক্ষণ তাহা জ্বলিবে, তারপর উহা ফুরাইয়া গেলে আলো আর কিছুতেই জ্বলিবে না। ঐ অবস্থায় আলোটি নিবিবার পূর্ব্বক্ষণে যদি পাত্রটি (বেলজার) সরাইয়া লইয়া আবার অক্সিজেন বাষ্প তথায় প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে আলো নিবিবে না। আমাদের দেশে উনান জ্বালাইবার জন্য পাখার সাহায্যে উনানে যে হাওয়া দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য

তথায় অধিক পরিমাণে অক্সিজেন বাষ্প সরবরাহ করা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

(খ) **নাইট্রোজেন** (বা যবক্ষারজান)—অক্সিজেন বাষ্প অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিলে আমাদের অনিষ্ট হয়। সুতরাং যাহাতে আমরা প্রয়োজনের অধিক পরিমাণ ঐ বাষ্প গ্রহণ না করি, সেই উদ্দেশ্যে বায়ুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে। এই বাষ্পটি সাক্ষাৎ-ভাবে মানুষের কোন উপকার না করিলেও, অতিরিক্ত পরিমাণ অক্সিজেনের অপকারিতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করে। আবার যদিও ইহা মানুষের পক্ষে পরোক্ষে উপকার করে, কিন্তু উদ্ভিজ্জের পক্ষে উহা (নাইট্রোজেন) প্রত্যক্ষ উপকারী। গম, মটরশুঁটি, নানাপ্রকার ডাল প্রভৃতির মধ্যে এই উপাদানটি প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান। এই বাষ্পটি বায়ুর মোট উপাদানের ⅘ অংশ।

(গ) **কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প** (বা অঙ্গারাম্লজান)—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বাষ্পই বায়ুর সর্ব্বপ্রধান (শতকরা ৯৯ ভাগের অধিক) উপাদান। তথাপি অপরাপর উপাদানসমূহেরও উপস্থিতি আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য না করিয়া পারি না, কারণ উহাদের কোন কোনটির অংশ অতি সামান্য মাত্র বাড়িলেই বায়ু দ্বারা আমাদের ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে। ঐরূপ উপাদানসমূহের মধ্যে কার্ব্বনিক এসিড অন্যতম। (প্রতি সহস্র ঘণ ফুটে এই বাষ্পের পরিমাণ ০·৬ ভাগ হইলে তাহা অনিষ্টকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।) এই বায়ু কার্ব্বন (অঙ্গার) ও অক্সিজেনের সমষ্টিমাত্র এবং

সাধারণ বাষ্প অপেক্ষা অধিক ভারী বলিয়া মাটীর ঠিক উপরেই (বায়ু মণ্ডলের সর্ব্বাপেক্ষা নীচে) থাকে। সকল প্রকার জীবজন্তু ও উদ্ভিদের মধ্যে কার্ব্বন অধিক পরিমাণে থাকে। সেজন্য যেখানে বহু লোক, জীবজন্তু বা গাছপালা একত্র থাকে তথায় এই বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই বায়ু এতই দূষিত বা অস্বাস্থ্যকর যে ইহার পরিমাণ বেশী হইলে সেরূপ বায়ুতে আলো সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া যায়, এমন কি মানুষেরও মৃত্যু হয়। কোন স্থানে আগুন লাগিলে এই বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সেজন্য অধিকক্ষণ আগুনের বা উনানের ধারে থাকিলেও স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এই বাষ্পেরও স্বাদ, গন্ধ বা বর্ণ নাই।

এই বাষ্প কেবল মাত্র আগুন বা নিঃশ্বাস-বায়ুতেই অধিক থাকে না। (প্রশ্বাস-বায়ুতে যে পরিমাণ কার্ব্বন ডাই-অক্সাইড থাকে, নিঃশ্বাস-বায়ুতে তাহা অপেক্ষা অধিক থাকে। কারণ, মানুষের শরীরে অনবরত দহন কার্য্য চলিতেছে এবং তাহার ফলে শরীরের মধ্যে এই বাষ্পের বৃদ্ধি হয় এবং সেজন্যই উহা নিঃশ্বাসের সহিত অধিক পরিমাণে বাহির হইয়া আসে)। যে স্থানে কোন প্রকার জিনিষ পচে তথায়ও ইহার পরিমাণ বেশী হয়। তাছাড়া কয়লার খনি, চুনের ভাটি, ড্রেণ প্রভৃতিতেও এই বাষ্প অধিক থাকে।

এই দূষিত বাষ্প নানা স্থানে উৎপন্ন হইলেও সৌভাগ্যবশতঃ ইহার পরিমাণ শতকরা মাত্র ০.০৪ ভাগ। যে স্থানেই ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি হয় সেখান হইতেই বায়ু প্রবাহের ফলে ইহা অন্যত্র

পরিচালিত হয় এবং এভাবে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত অনবরত মিশিয়া গিয়া ইহার পরিমাণ কমিয়া থাকে। তাছাড়া জীবজন্তুর দেহ হইতে, বা অন্য বিভিন্ন উপায়ে যে কার্ব্বন-ডাই-অক্সসাইডের উৎপত্তি হয়, তাহা গাছপালা দিনের বেলা গ্রহণ করে। তাহার ফলেও বায়ুমণ্ডলে ইহার পরিমাণ কমিয়া থাকে। (অবশ্য, রাত্রিতে গাছপালা ঐ বায়ু ত্যাগ করে। সেজন্য রাত্রিতে বনে বা গাছের ধারে যাওয়া নিষিদ্ধ)। সমুদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি দ্বারাও এই বাষ্প অনেক পরিমাণে কমিয়া থাকে, কারণ এই বাষ্প জলে গলিয়া যায়। সেজন্য বৃষ্টির পরে বা সমুদ্রের উপরে এই বাষ্পের পরিমাণ কমিয়া থাকে।

বায়ুতে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প আছে কিনা তাহা অতি সহজে একটু মাত্র স্বচ্ছ চূনের জলের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়। স্বচ্ছ চূনের জলের সহিত ঐ বাষ্প মিশিলেই তাহার রঙ সাদা হইবে। সেজন্য কোন স্থানে স্বচ্ছ চূনের জল রাখিয়া তাহার উপর ফুৎকার দিলে যদি জল সাদা হয় বা জলের উপর একটি সাদা পর্দ্দার মত পড়ে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বায়ুতে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড বাষ্প আছে।

(ঘ) **জলীয় বাষ্প**—বায়ুর মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহার পরিমাণ বিভিন্ন ঋতুতে পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে তাহার উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। আবার শীতকালে তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। অতিরিক্ত জলীয় বাষ্পযুক্ত (আর্দ্র) বায়ু ও অধিক উত্তাপ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, কিন্তু অল্প জলীয়

বাষ্পযুক্ত বায়ু অধিক উত্তাপ হইলেও স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। সাধারণতঃ নদী বা সমুদ্রের ধারে বাতাসে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে।

(ঙ) **এমোনিয়া**—জীবজন্তু বা গাছপালা পচিয়া এই বাষ্পের সৃষ্টি হয়। ইহাতে তীব্র গন্ধ থাকে এবং ইহা সাধারণতঃ নাইট্রোজেনের সহিত মিশ্রিত থাকে। এই বাষ্প স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।

(চ) **ওজোন**—এই বাষ্পের মধ্যে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন থাকে। ইহা সমুদ্রের বা পাহাড়ের গায়ে পাওয়া যায়। ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

জন-প্রতি বিশুদ্ধ বায়ুর পরিমাণ নির্ণয়ের আবশ্যকতা

বায়ুর উপাদন-সমূহের মধ্যে কতকগুলি আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ইহাদের মধ্যে কার্ব্বনিক এসিডের বিষয় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ১০০০ ঘনফুট (cubic feet) পরিমিত আবদ্ধ স্থানে প্রতি ২০ মিনিটে একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির নিঃশ্বাস হইতে ০২ ভাগ কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প নির্গত হয় এবং ঐ বায়ুর মধ্যে ০·৪ ভাগ ঐরূপ বাষ্প স্বভাবতঃই থাকে। সুতরাং ২০ মিনিট সময়ে ঐ স্থানে মোট ০·৬ ভাগ কার্ব্বনিক এসিড বাষ্পের সৃষ্টি হয়। ঐ পরিমাণ বাষ্প লোকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় বিপজ্জনক। এজন্যই লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন

যাহাতে কোন স্থানে ঐ পরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প কিছুতেই সঞ্চিত হইতে না পারে। এইজন্য জনপ্রতি বিশুদ্ধ বায়ুর পরিমাণ নির্ণয় একান্ত আবশ্যক।

উপরিলিখিত কারণ- বরণ হইতে বুঝা যায় যে প্রতি ২০ মিনিটে ১০০০ ঘনফুট পরিমিত বদ্ধ-স্থানে ০·৬ ভাগ ঐ বাষ্পের সৃষ্টি হয়। সুতরাং যাহাতে ঐরূপ স্থান কোন ক্রমেই ২০ মিনিট কাল এক সঙ্গে সম্পূর্ণ বদ্ধ না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু, কার্য্যতঃ তাহা সম্ভবপর হয় না। কারণ, অনেক সময় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী সময় কাহারও কাহারও পক্ষে সাবমেরিণ বা ডুবো-জাহাজে, কল-কারখানা প্রভৃতিতে রুদ্ধ-কক্ষে কাজ করা দরকার হয়। সুতরাং ঐ সকল ক্ষেত্রে প্রত্যেক পূর্ণ-বয়স্ক ব্যক্তির জন্য প্রতি ২০ মিনিটে ১০০০ ঘনফুট বা প্রতি ঘণ্টায় ৩০০০ ঘনফুটের অধিক বিশুদ্ধ বায়ু সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অবশ্য ঐরূপ বদ্ধ ঘরে কোন প্রকারে ভেন্টিলেটারের সাহায্যে বা অন্য কোন উপায়ে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে জনপ্রতি আরও কম স্থান হইলেও হয়। সকল লোক বদ্ধ ঘরে কাজ করে না, কাজেই ঐরূপ হিসাব অনুযায়ী স্থানের ব্যবস্থা সকলের পক্ষে দরকার নাই। কিন্তু, ঘরের ভিতর ও যেখানে মানুষ বাস করে, বা কাজ করে তথায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা প্রয়োজন। কারণ ঘরের দরজা জানালা প্রভৃতি যতই খোলা থাকুক না কেন, অধিক লোক থাকার বা কাজ করার ফলে তথায় কার্ব্বনিক

এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পাইবেই। সেজন্য জনপ্রতি নিম্নলিখিত হিসাব অনুসারে স্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ঘরেই কিছু আসবাব পত্র ও অন্য জিনিষ থাকে। উহাদের দ্বারা বায়ু-চলাচলের বিঘ্ন হয় এবং ঘরের মেঝের আয়তন (floor space) অনেকটা কমিয়া যায়; সেজন্য ঐ সকল জিনিষ যতটা সম্ভব বাসগৃহ (শয়নঘর) এবং অফিস ইত্যাদি হইতে সরাইয়া রাখা দরকার। তবে ইহা সত্য যে ঐ সকল জিনিষকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দেওয়া চলে না। কাজেই জনপ্রতি স্থানের হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল জিনিষ বাদ দিয়া, ঘরের বাকী অংশের মেঝের আয়তন এবং ঘরে বায়ুর ঘন-আয়তন (cubic space or cubic feet of air space) স্থির করিতে হয়। এই হিসাব করিবার সময় লক্ষ্য করা দরকার যে ঘরের মেঝের আয়তন ঘন-আয়তনের অন্ততঃ ১/১২ অংশ হয়। কারণ মেঝের আয়তন আরও কমাইয়া উচ্চতা বাড়াইলে ঘন-আয়তন ঠিক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা দ্বারা লোকের চলাফেরা, কাজ করা বা স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। প্রত্যেক ঘরের জিনিষপত্র বাদে মোট মেঝের আয়তন ও ঘন-আয়তন এবং লোক সংখ্যা জানা দরকার। লোক সংখ্যা দ্বারা ঐ দুই অঙ্ককে ভাগ দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাই জনপ্রতি মেঝের আয়তন বা বায়ুর ঘন-আয়তন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অন্তত পক্ষে নিম্নলিখিত হারে **জনপ্রতি মেঝের আয়তন ও ঘন-আয়তন** একান্ত আবশ্যক।

	মেঝের আয়তন-বর্গফুট	বায়ুর ঘন-আয়তন, ঘনফুট
ছাত্র	(floor space)	(cubic space)
বিদ্যালয়ে (স্কুলে)	৮ হইতে ১৫	১০০
ছাত্রাবাসে (হোষ্টেলে)	৬০ " ৭২	৪০০
রোগী		
সাধারণ	১০০ " ১৪০	১২০০ হইতে ১৬
সংক্রামক	১৪০ " ২০০	২০০০
প্রস্থতি	১০০ " ১৫০	১২০০ " ২০
বাড়ীতে (শয়ন ঘরে)		
শিশু		৫০০
পূর্ণবয়স্ক লোক	৪০০	১০০০
অফিস বা কারখানায়		
সাধারণ কাজ		
অধিক কাজ		৪০০
কঠোর পরিশ্রম		৩০০০

উপরিলিখিত হিসাব অনুসারে প্রত্যেক বাড়ীঘর, অফিস, কারখানা প্রভৃতিতে জনপ্রতি স্থানের ব্যবস্থা করিলে স্বাস্থ্য-রক্ষা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

মনুষ্যবাসের ফলে বায়ুর উপাদানের পরিবর্ত্তন

প্রশ্বাসের সহিত মানুষ যে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করে এবং নিঃশ্বাসের সহিত যে দূষিত বায়ু ত্যাগ করে এই উভয়ের উপাদানের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায়।

	বিশুদ্ধ বায়ু	দূষিত বায়ু
অক্সিজেন	শতকরা ২০'৯৬ ভাগ	১৬'৪ ভাগ
নাইট্রোজেন	„ ৭৯'০ „	৭৯'০ „
কার্ব্বনিক এসিড্	০'০৪ „	৪'৬ „
জলীয়-বাষ্প, রোগ-জীবাণু প্রভৃতি	অতি সামান্য	বেশী হয়।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে প্রত্যেক লোকের নিঃশ্বাসের সহিত কার্ব্বনিক এসিড্, জলীয়-বাষ্প, রোগ-জীবাণু প্রভৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিতকর উপাদানসমূহের পরিমাণ বাড়ে, অথচ অক্সিজেনের ভাগ কমে। সুতরাং এক সঙ্গে অধিক লোক কোথাও বাস করিলে, বা কাজ করিলে পরস্পরের নিঃশ্বাস-বায়ুর সহিত যে পরিমাণ দূষিত জিনিষ নির্গত হয়, তাহা মিলিত হইয়া ঐ স্থানের বায়ুকে শীঘ্রই অতিশয় দূষিত করিয়া ফেলে। অধিক লোক একত্র থাকার ফলে বায়ুর মধ্যে উপরিলিখিত পরিবর্ত্তন সাধিত হওয়া ছাড়াও পরস্পরের দেহের উত্তাপের ফলে ঐ স্থানের উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এবং কলকারখানার নানা প্রকার ধূলা, বালি, ঘামের গন্ধ, দূষিত বাষ্প, প্রভৃতি দ্বারা ও বায়ু দ্রুত দূষিত হইয়া থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ঘরে অধিক লোক থাকার ফলে, কেহ কেহ হাই তোলে, বা জোরে নিঃশ্বাস ফেলে, কাহারও বা ঘাম হয়। ইহা দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে মানুষ অতিরিক্ত উত্তাপ লাঘব করিবার চেষ্টা করে মাত্র। কিন্তু অনেক সময়েই ঐ ঘাম শুকায় না বলিয়া সর্দ্দি-

গৰ্ম্মি হয়, গা বমি করে, মাথা ঘুরে। বায়ু দূষিত হওয়ার ফলে মাঝে মাঝে সভা সমিতিতে, ভিড়ে বা কলকারখানাতে লোক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। কিন্তু সে সকল স্থান হইতে একটু দূরে গেলেই যেন লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

কলকারখানা বা অফিস প্রভৃতি—যে সকল স্থানে বহু লোক একত্র কাজ করে, বা সভাসমিতিতে যেখানে বহুলোক একত্রিত হয়, তথায় কোন কারণে বায়ু চলাচল কমিয়া গেলে, লোকের অস্থিরতা আরও বাড়িয়া যায়। ঐ অবস্থায় বেশীক্ষণ থাকা বা কাজ করা অসম্ভব হয়। অপর দিকে, সে সকল স্থানে কৃত্রিম উপায়ে (বৈদ্যুতিক পাখা, ভেন্টিলেটার প্রভৃতির সাহায্যে) বায়ু-চলাচলের সাহায্য হইলে আর সেরূপ কষ্ট হয় না। এমন কি সেক্ষেত্রে লোকের কৰ্ম্মশক্তি ও স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়।/

দূষিত বায়ু

পূর্ব্বোল্লিখিত বিভিন্ন বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, বায়ু নানা কারণে দূষিত হয়। বায়ু সাধারণতঃ নিম্নলিখিত কারণে দূষিত হয়।

১. দহন ক্রিয়া—বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক এসিড্ বাষ্প ও অন্যান্য বাষ্প, অগ্নির উত্তাপ, ছাই, ভস্ম প্রভৃতি দ্বারা বায়ু দূষিত হয়।

2. পচন ক্রিয়া—জীবজন্তুর দেহ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি নানা প্রকার জিনিষ অনবরতই পচিতেছে এবং ঐরূপ পচনের ফলে উগ্র গন্ধ বাহির

হইয়া বায়ুকে দূষিত করে। ৩. ভূমি—মাটির উপরে যে কত প্রকার পচা ও দূষিত জিনিষ, রোগের জীবাণু প্রভৃতি থাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহারা অনবরতই বায়ুর সহিত মিশিতেছে এবং তাহার ফলে বায়ু দূষিত হয়। ৪. জল—নালা, নর্দ্দমা, ডোবা প্রভৃতিতে কখন কখন আবর্জ্জনাদি জমিয়া বা অন্য কারণে জল পচিয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানের উপর দিয়া প্রবাহিত বায়ু উহাদের সংস্পর্শে দূষিত হয়। ৫. অতিরিক্ত লোকবসতি ও কলকারখানা—সহর, বন্দর, সভাসমিতি প্রভৃতি যে সকল স্থানে অতিরিক্ত লোক বাস করে বা সমবেত হয় তথায় পরস্পারের শ্বাসপ্রশ্বাসের ফলে বায়ু দূষিত হয়। তাছাড়া অধিক লোকের বাসের ফলে বা কারখানা প্রভৃতি হইতে নির্গত ধূম, বাষ্প প্রভৃতি দ্বারা বায়ু অনবরত দূষিত হইয়া থাকে। ৬. রোগ-জীবাণু—নানা প্রকার রোগের জীবাণু দ্বারা বায়ু অতি শীঘ্র এবং সহজেই দূষিত হয়। সহর, বন্দর প্রভৃতি স্থানে, অর্থাৎ যেখানে বহুলোকের একত্রে বসবাস এইরূপ স্থানে বায়ু অধিক পরিমাণে দূষিত হয়।

বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজনীয়তা

দূষিত বায়ু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আমাদের অনিষ্ট করিয়া থাকে। সভাসমিতি বা ভিড়ের মধ্যে দূষিত বায়ুর প্রভাবে মানুষ মূর্চ্ছিত হয়, এমন কি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক প্রকার রোগের জীবাণু বায়ুর মধ্য দিয়া সুস্থ-ব্যক্তির শরীরে

প্রবেশ করিবার অল্প-কাল পরেই ঐ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়। বড় বড় সহর ইত্যাদিতে কখন কখন দেখা যায় যে, অনেক লোকের স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে খারাপ হইয়া পড়িতেছে এবং কিছুকাল তাহারা বাহিরে ঘুরিয়া আসিলে বা 'বায়ু-পরিবর্ত্তন' করিয়া ফিরিলে আবার স্বাস্থ্য ভাল হইয়া থাকে। এরূপ নানা ভাবে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন আছে। পল্লীগ্রামে, খোলা মাঠের ধারে বা নদীর কূলে যাহারা বাস করে, তাহারা অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু পাইয়া থাকে বলিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য স্বভাবতঃ সহরবাসীগণের স্বাস্থ্য অপেক্ষা ভাল। এজন্যই আজকাল অনেক সময় কোন কোন রোগীকে 'বায়ু-পরির্ত্তনে'র জন্য সহর হইতে দূরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সকল স্থানে গিয়া রোগী বিনা ঔষধে স্বাস্থ্য ভাল করিয়া থাকে। এমন কি কোন সহরের উপর দিয়া জোরে বায়ু প্রবাহিত হইয়া গেলে, বা ঝড় বৃষ্টি হইলে তাহার পরে সহরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া থাকে। এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, ঝড় বৃষ্টি বা জোর বায়ু-প্রবাহের দ্বারা সহরের দূষিত বায়ুর মধ্য হইতে ময়লা, আবর্জ্জনা, দুর্গন্ধ, রোগ-জীবাণু প্রভৃতি দূরে চলিয়া যায় এবং তাহা দ্বারাই তথাকার বায়ু অনেক পরিমাণে শোধিত হয়। বহুক্ষণ যাহারা কলকারখানায় বা বদ্ধঘরে কাজ করে, তাহারাও যেই মাত্র বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, তখনই বাহিরের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বায়ুর সংস্পর্শে উহারা অনেক আরাম এবং শান্তি বোধ করে। এজন্যই বিশুদ্ধ

বায়ু জীবমাত্রের স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তির পক্ষে এত অধিক প্রয়োজনীয়।

বায়ুর দ্বারা সংক্রামিত ব্যাধি

দূষিত বায়ুর মধ্যে নানাপ্রক দূষিত বাষ্প, রোগের জীবাণু প্রভৃতি থাকে এবং ঐ সকল উপাদানের পার্থক্য অনুসারে বায়ুর অপকারিতারও পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণতঃ যেখানে কোন রোগী থাকে, সেখানে ঐ রোগীর আশে-পাশে তাহার থুথু, মলমূত্র প্রভৃতির মধ্যে নানাপ্রকার রোগের জীবাণু থাকে। ঐ সকল জীবাণু অনবরত বায়ুর সহিত মিশিয়া বায়ুকে দূষিত করে। সেজন্যই তথায় ফিনাইল প্রভৃতি জীবাণু-নষ্টকারী জিনিষ রাখা বা disinfectant ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাহা হইলে জীবাণু আর সহজে বায়ুর সহিত মিশিয়া বায়ুকে দূষিত করিতে পারে না। তারপর, যে সকল রোগের জীবাণু রোগীর শরীর হইতে বাহিরে আসে তাহার সকলগুলি একই নিয়মে অন্য লোকের শরীরে প্রবেশ করে না। কতক জীবাণু জলের মধ্য দিয়া, কতক বায়ুর মধ্য দিয়া এমনিতর বিভিন্ন উপায়ে রোগ-জীবাণু লোকের শরীরে প্রবেশ করে।

ক্ষয়কাশ, হুপিংকাশি, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণু হাঁচি, কাশি প্রভৃতির সঙ্গে রোগীর শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর সহিত মিশিয়া গিয়া বায়ুকে দূষিত করে। ঐ অবস্থায় রোগীর নিকটে কোন লোক থাকিলে রোগীর কাশি,

হাঁচি প্রভৃতির সহিত নির্গত রোগের জীবাণু অপর লোকের দেহে সহজে প্রবেশ লাভ করে। বসন্ত, হাম, খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার চর্ম্মরোগ; কলেরা, টাইফয়েড্, নানা-রকম দূষিত জ্বর প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার রোগের জীবাণুই রোগীর মলমূত্র, ঘাম প্রভৃতির সহিত বাহিরে আসে। বাহিরে আসিয়া রোগের জীবাণু বায়ুতে মিশিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা ঐ সকল রোগ অপর লোকের শরীরে সংক্রামিত হয়।

বায়ু-সঞ্চালন ও পরিশুদ্ধি

দূষিত বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর এবং বিশুদ্ধ বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। এই সরল সত্য বিষয়টি সকলেই জানেন। কাজেই যাহাতে দূষিত বায়ুর পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বায়ু লাভ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

কোন স্থানের দূষিত বায়ুকে সরাইয়া দিয়া তথায় বিশুদ্ধ বায়ু-প্রবাহের ব্যবস্থাই বায়ু-পরিশুদ্ধির একমাত্র উপায়। বায়ু সতত সঞ্চরমান, ইহা কখনও কোথাও স্থির থাকে না। কাজেই একই স্থানের বায়ুকে তথায় আটকাইয়া রাখিয়া শোধন করিয়া তাহার দূষিত অংশসমূহকে দূর করা বায়ু-পরিশুদ্ধির উদ্দেশ্য নহে। সেজন্যই বায়ু-পরিশুদ্ধির মূল কথা হইতেছে দূষিত বায়ুর পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবাহ। ইহাকেই **বায়ু-সঞ্চালন** (Ventilation) বলে। এই বায়ু-সঞ্চালন দুই প্রকারের—প্রথমতঃ বাটীর

বাহিরের দিকের (External ventilation) এবং দ্বিতীয়তঃ বাটীর ভিতরের দিকের (Internal ventilation).

আমাদের বাসভূমির বাহিরের বায়ু-সঞ্চালন এবং বাটীর ভিতরের বায়ু-সঞ্চালন উভয়ই আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। প্রথম বিষয়টি সহর, বন্দর বা গ্রামের সকলের সাধারণ স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বলিয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সে বিষয়ে ব্যবস্থা করিবেন। যথা, সহর, নগর প্রভৃতির মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে লোকের বাড়ীঘর খুব ঘন না হয়, যাহাতে বাহির হইতে বিশুদ্ধ বায়ু সহজেই তথায় প্রবেশ করিতে পারে ইত্যাদি। সেজন্য কোন নদী বা খোলা মাঠের ধারে সহর তৈয়ার করা, মাঝে মাঝে পার্ক, খেলার মাঠ, খোলা জায়গা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। এরূপ ব্যবস্থার ফলে সাধারণ স্বাস্থ্য ভাল থাকিবার সম্ভাবনা। কারণ এক্ষেত্রে বায়ু-পরিশুদ্ধির ও অবাধ সঞ্চালনের সুবিধা থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক গৃহস্থের আপন আপন বাটীর ভিতরে যাহাতে অবাধে বায়ু-সঞ্চালনের সুবিধা থাকে তাহার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বাড়ীগুলি একটু দূরে দূরে তৈয়ার করা, মাঝখানে উঠান রাখা, ঘরের উপযুক্ত দরজা জানালা রাখা, বাড়ীর খুব নিকটেই ঝোপ বা গাছপালা না রাখা ইত্যাদি ব্যবস্থা দ্বারা বাড়ীর ভিতর বায়ু-সঞ্চালনের সুব্যবস্থা করা হয়।

বায়ু-সঞ্চালন ও পরিশুদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কতকগুলি স্বাভাবিক ও কয়েকটি কৃত্রিম বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। স্বাভাবিক উপায়সমূহ দ্বারা বায়ু অতি সহজেই পরিশুদ্ধ হইতে

পারে এবং উহাদের উপকারিতাও খুব বেশী। বায়ু-শোধনের স্বাভাবিক উপায় সমূহ—

সূর্য্যকিরণ—সূর্য্যের রশ্মি হইতে আমরা আলোক ও উত্তাপ পাইয়া থাকি। অনেক প্রকার পোকা, জীবাণু প্রভৃতি কোন প্রকার আলো বা উত্তাপ সহ্য করিতে পারে না। সেইজন্যই যে স্থানে অধিক পরিমাণে সূর্য্যকিরণ পাওয়া যায়, তথাকার বায়ু জীবাণু-শূন্য থাকে। সূর্য্য-রশ্মি দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হয়। সুতরাং ঐ উপায়েও বায়ুর পরিশুদ্ধি ঘটে, ইহা ছাড়া সূর্য্য-কিরণ ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং ঐরূপ উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে বায়ু উত্তপ্ত ও হালকা হয়। ইহার ফলে ঐ বায়ুর চাপ কমিয়া যায় এবং শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এভাবে সূর্য্যকিরণ বায়ু সঞ্চালনের পক্ষেও বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। এই সূর্য্যকিরণের জন্যই প্রতিদিন বিকাল বেলা সমুদ্র বায়ু এবং শেষরাত্রে স্থল বায়ু প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের বায়ু-প্রবাহ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

বৃষ্টি—বৃষ্টির জলদ্বারা বায়ু বিশেষ ভাবে শোধিত হয়। জলের মধ্যে যে সকল উপাদান থাকে তাহাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা বায়ুস্থিত ধূলা, বালি প্রভৃতি গলিয়া নীচে পড়িয়া যায় এবং তাহার ফলে বায়ু-মণ্ডল বিশুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ জল ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া গড়াইয়া যাওয়ার সময় ময়লা, আবর্জ্জনা প্রভৃতি বহন করিয়া লয়। তাহার ফলে বায়ু আর ঐ সকল ভূপৃষ্ঠস্থ দূষিত জিনিষের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। সুতরাং বায়ু পরিশুদ্ধ হয়।

ঝড়—বালুকা-ঝড় (Dust storm), বজ্রপাত (Thunder storm) প্রভৃতি নানাপ্রকার ঝড় বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে প্রবাহিত হয়। বালুকা-ঝড়ের ফলে বায়ু অধিকতর দূষিত হয়, কারণ উহাদ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ বালুকারাশি উড়িয়া আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলে। কিন্তু অন্য প্রকার ঝড় দ্বারা বায়ুর পরিশুদ্ধি ঘটে। সাধারণ ঝড়ের সময়ে যখন বায়ু জোরে প্রবাহিত হয়, তখন উহার সাহায্যে বায়ু পরিশুদ্ধ হয়। কাজেই উহা বায়ু সঞ্চালনের পক্ষে খুব উপকারী। তাছাড়া কোথাও খুব বেশী গরম না পড়িলে ঝড় হয় না (কারণ, ঝড়ের জন্য নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি একান্ত প্রয়োজন এবং উত্তাপের আধিক্যই নিম্নচাপের কারণ)। কাজেই যেই মাত্র কোথাও খুব গরম পড়ে ও নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, তখনই চারিদিক হইতে বায়ু তথায় প্রবাহিত হয়। কাজেই ঝড় বায়ু-সঞ্চালনের পক্ষে বিশেষ-ভাবে সাহায্য করে। বজ্রপাত সহ যে ঝড় প্রবাহিত হয় তাহা দ্বারা গাছপালা, এমন কি কখন কখন জীবজন্তুর মৃত্যু হইলেও, উহার ফলে বায়ুতে যে ওজন বাষ্পের বৃদ্ধি হয় তাহা বায়ুর পরিশুদ্ধির পক্ষে বিশেষ উপকারী।

জল—সমুদ্র, বৃহৎ জলাশয়, নদী প্রভৃতি নিকটে থাকিলে স্থলবায়ু বিশুদ্ধ হয়। তাছাড়া উহাদের উপরকার বায়ুও বিশুদ্ধ থাকে।

বৃক্ষ—গাছপালা বিভিন্ন উপায়ে বায়ু-সঞ্চালনের সাহায্য করে। প্রথমতঃ গাছপালার সবুজ পাতা (তথায় ক্লোরোফিল chloro-

phyll নামক উপাদান থাকার ফলে) বায়ু হইতে অঙ্গার জাতীয় উপাদান (carbon) গ্রহণ করে এবং অম্লজান (oxygen) বাষ্প ত্যাগ করে বলিয়া তথাকার বায়ু বিশুদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ কোথাও গভীর বন থাকিলে বৃষ্টিপাত হয়। (গাছপালা হইতে যে জলীয় বাষ্প নির্গত হয়, তাহা বায়ু-মণ্ডলস্থিত জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত হইতে সাহায্য করে)। উহা পরোক্ষভাবে বায়ু পরিশুদ্ধ করে। তৃতীয়তঃ নিম, তুলসী, পাইন, কর্পূর, ইউকেলিপটাস প্রভৃতি কতকগুলি গাছ প্রত্যক্ষ-ভাবে বায়ু পরিশুদ্ধ করে। উহাদের হাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে (বিশেষ বিশেষ রোগ-নিবারণের পক্ষে) খুব উপকারী।

কৃত্রিম উপায়-সমূহ—উত্তপ্ত ও হালকা বায়ু উপরে উঠিয়া যায় এবং শীতল ও ভারী বায়ু নীচের দিকে প্রবাহিত হয়—ইহা বায়ু-প্রবাহের সাধারণ নিয়ম। ঘরের ভিতরের বায়ু লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে, উনুন প্রভৃতির উত্তাপে বা কলকব্জার ঘর্ষণে অধিক উত্তপ্ত হয়। ঐ বায়ু যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে ঘরের উপরদিকে ছিদ্র (Ventilator) বা দেওয়ালে ফাঁক রাখা দরকার। আবার যাহাতে বাহির হইতে শীতল বায়ু সহজে ঘরে আসিতে পারে, সেজন্য দেওয়ালে বৈদ্যুতিক পাখা (Air propeller fan), দূষিত পদার্থ সংগ্রহ করিবার যন্ত্র (Vacuum cleaner) প্রভৃতি জিনিষ বিশেষ উপকারী।

বায়ু-পরিশুদ্ধির জন্য নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যও খুব উপকারী। বালি, কাঠ-কয়লা চূর্ণ, চুণ প্রভৃতি অনেক দুর্গন্ধ নষ্ট

করে এবং দূষিত পদার্থকে বিশোধিত করে। ফিনাইল, তারপিন তৈল, ব্লিচিং-পাউডার প্রভৃতি জিনিষ এ বিষয়ে বিশেষ উপকারী। আবার ধূপ, ধূনা, আলকাতরা প্রভৃতি জ্বালাইলে যে ধোঁয়া হয় তাহাও বায়ু-পরিশুদ্ধির পক্ষে খুব উপকারী

জল

জলের অপর নাম জীবন। বাস্তবিক পক্ষে মানুষ এবং অপর সকল প্রকার জীবজন্তুর জীবন-ধারণের পক্ষে জল এতই দরকারী যে উহার এই নামটি সার্থক। জল ছাড়া কেহই বাঁচিতে পারে না। আমরা জল পান করি, জল দ্বারা স্নান, শৌচ প্রভৃতি করি, বাসন, কাপড়চোপড় প্রভৃতি পরিষ্কার করি। এইরূপ অসংখ্য কাজে জলের প্রয়োজন। তাছাড়া আমাদের শরীর হইতে প্রত্যহ প্রস্রাব, ঘাম প্রভৃতির মধ্য দিয়া শরীরের যে পরিমাণ (শতকরা ৫ ভাগ) জল বাহির হইয়া যায়, তাহা পূরণ করিবার জন্যও জল দরকার।

জন-প্রতি জলের পরিমাণ নির্ণয়ের আবশ্যকতা

বিভিন্ন দেশে জলের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মত গরম দেশে প্রত্যহ স্নান না করিলে শরীর অসুস্থ হয়। এমন কি গরমের সময় দিনে দুইবার স্নান করা দরকার হয়। অথচ শীতপ্রধান দেশে তাহার দরকার হয় না। গরম দেশের লোকের স্নান ছাড়া, কাপড় কাচা, হাত-পা ধোয়া ভৃতি কাজের জন্যও জল দরকার। ঋতুভেদেও জলের

পরিমাণ কম-বেশী হয়। গ্রীষ্মকালে সকল দেশেই শীতকাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জল প্রয়োজন। তাছাড়া সুস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য অধিক পরিমাণ জল প্রয়োজন। সুতরাং বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীগণের বিভিন্ন কাজের জন্য কি পরিমাণ জল দরকার তাহা স্থির করা একান্ত আবশ্যক। এরূপ ভাবে প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ স্থির করিতে না পারিলে জল সরবরাহ বিষয়ে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটে। শীতপ্রধান দেশে নিম্ন-লিখিত কাজ-কর্ম্মের জন্য জনপ্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ জলের দরকার।

১।	গৃহস্থালীর জন্য—		২০ গ্যালন
২।	রাস্তাঘাট, যাতায়াত, ব্যবসায় প্রভৃতি বিভিন্ন কাজের জন্য—		২০।২৫ গ্যালন
(১)	স্নান	৮ গ্যালন	
	পায়খানা	৫ গ্যালন	
	কাপড় কাচা	৩ গ্যালন	
	বাসন মাজা	৩ গ্যালন	
	অন্যান্য	১ গ্যালন	
(২)	ঘোড়ার জন্য	১৬ গ্যালন	
	গরুর জন্য	১০ গ্যালন	
	রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি	৫ গ্যালন	
	ব্যবসায়-বাণিজ্য	৪ গ্যালন	

শীত-প্রধান দেশে জনপ্রতি দৈনিক সাধারণতঃ ৪০।৪৫ গ্যালন জল দরকার, কিন্তু কলিকাতা সহরে জনপ্রতি প্রায় ৪৬ গ্যালন

বিশুদ্ধ জলই দেওয়া হয়। তাছাড়া গঙ্গার জল বা অপরিষ্কার জলও যথেষ্ট পরিমাণ দেওয়া হয় এবং তাহার দ্বারা রাস্তা, পায়খানা পরিষ্কার প্রভৃতি কাজ হইয়া থাকে। এদেশে গ্রীষ্মকালে কেবল-মাত্র গৃহস্থালীর জন্যই ৪০ গ্যালন জল দরকার এবং শীতকালে তাহা অপেক্ষা ১০ গ্যালন কম দরকার হয়।

জল সরবরাহ

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে যেমন জনপ্রতি প্রয়োজনীয় জলের পরিমাণ পৃথক, তেমনই জলপ্রাপ্তির উপায়সমূহও পৃথক। সাগর ও মহাসাগরসমূহ ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৩।৪ অংশ ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইলেও আমরা আমাদের দৈনিক ব্যবহারের জন্য জল সাগর বা মহাসাগর হইতে পাই না। উহা আমরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে পাইয়া থাকি।

বৃষ্টি—সাগর, মহাসাগর হইতে সূর্য্যের উত্তাপে যে জলীয় বাষ্প অনবরত সৃষ্টি হইতেছে তাহা ক্রমে মেঘরূপে পরিণত হয় এবং তাহাই বৃষ্টিপাতের কারণ। এই বৃষ্টির জলের কতক অংশ মানুষ প্রথম অবস্থায়ই নানা প্রকার পাত্রে ধরিয়া রাখে এবং বাকী জলের অধিকাংশ হয় কোন পুকুর, কূপ ইত্যাদিতে জমা হয়, সাগর বা নদীতে পতিত হয়, বা মাটীর মধ্য দিয়া চুয়াইয়া যায়।

পুকুর—সমভূমি-অঞ্চলে, বিশেষতঃ যে সকল দেশে অনেক নদ-নদী আছে, তথায় সহজেই পুকুর খনন করিয়া জল পাওয়া যায়। ভূগর্ভস্থ জল পুকুরে আসিয়া জমা হয় বলিয়া গভীর পুকুর

সমূহে সমস্ত বৎসরই জল পাওয়া যায়। উহাদের জল পরিষ্কারও থাকে। অল্প গভীর বা ছোট পুকুরের জল কখন কখন শুকাইয়া যায় বা নষ্ট হইয়া থাকে। পুকুর খুব বড় হইলে তাহা দীঘি, সরোবর প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়। কখন কখন তাহাদিগকে সাগর বলে। [যথা—ধর্ম্মসাগর (কুমিল্লা)]।

কূপ—অপেক্ষাকৃত অসমতল স্থানসমূহে বা যেখানে পুকুর সহজে খনন করা যায় না, তথায় কূপ হইতেই জল পাওয়া যায়। কূপ বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। ভূগর্ভস্থ জল সকল প্রকার কূপেই আসিয়া সঞ্চিত হইলেও সকল কূপ সমান উপকারী নহে। কাঁচা কূপের জল সহজেই দূষিত হয়; পাকা কূপের জল তাহা অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার থাকে। নলকূপের জল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিষ্কার থাকে এবং তাহা হইতে অনেক বেশী পরিমাণ জলও পাওয়া যায়। আজকাল অনেক জায়গায় আর্টেজীয় কূপের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ জল পাওয়া যায় এবং তাহা দ্বারা অষ্ট্রেলিয়ার মত শুষ্ক মহাদেশেও চাষবাসের খুব সুবিধা হইতেছে।

প্রস্রবণ—পৃথিবী যে সকল উপাদান দ্বারা গঠিত তাহারা বিভিন্ন প্রকার। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির মধ্য দিয়া জল সহজেই চুয়াইয়া যায়; কাজেই তাহাদিগকে প্রবেশ্য-শিলা (Pervious rocks) বলে। আর কতকগুলির ভিতর দিয়া জল চুয়াইয়া যায় না বলিয়া তাহাদিগকে অপ্রবেশ্য শিলা (Impervious rocks) বলে। এরূপ প্রবেশ্য ও অপ্রবেশ্য স্তরসমূহের সংযোগ স্থলে কখন কখন

ভূগর্ভস্থ জল নানা-প্রকার ফাটল বা ছিদ্রের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে। উহাদিগকে প্রস্রবণ বলে। কতক প্রস্রবণের মধ্য দিয়া উষ্ণ জল বাহিরে আসে বলিয়া উহাদিগকে উষ্ণ-প্রস্রবণ (Hot spring) বলে। যাহাদের মধ্য দিয়া ধাতব পদার্থ মিশ্রিত জল বাহিরে আসে তাহাদিগকে ধাতব-প্রস্রবণ (Mineral spring) বলে। অনেক ধাতব-প্রস্রবণের জল রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

নদী—সহর, বন্দর এমন কি গ্রামসমূহে নদী হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল পাওয়া যায়। বাঙ্গালার মত নদীমাতৃক প্রদেশে অন্য কোন উপায়েই নদীর মত অধিক জল সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে। আবার কোন কোন শুষ্ক অঞ্চলে নদী দেখাই যায় না। নদীতে স্রোত থাকে বলিয়া জল দূষিত হইলেও তাহা সহজেই শোধিত হইয়া থাকে।

উপরিলিখিত সাধারণ উপায় ছাড়া বড় বড় সহর, বন্দরসমূহে পান করার জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে বড় বড় দীঘি, পুকুর প্রভৃতি রিজার্ভ (Reserved) করিয়া রাখা হয়। কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি বৃহৎ নগরে পুকুর বা দীঘির জলের দ্বারা মানুষের জলের প্রয়োজন মিটে না, সেজন্য নদীর জলকেই ফিল্টার (filter) করিয়া সরবরাহ করা হয়। পাড়াগাঁয়ে খানা, ডোবা, খাল, প্রভৃতিতে অনেক জল জমিয়া থাকে এবং তাহাও নানা কাজে ব্যবহৃত হয়।

দূষিত জল

নদী, খাল, বিল, পুকুর প্রভৃতি যে সকল উপায়ে সহর বা গ্রামে জল সরবরাহ হয়, তাহাদের জল নানা কারণে দূষিত হয় এবং সাধারণতঃ আমরা বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা দূষিত জলই অধিক পরিমাণে দেখিয়া থাকি। কোন কোন সময় আমরা জলকে খালি চোখেই ময়লাযুক্ত দেখিতে পাই, কিন্তু যে সময় উহাকে নির্ম্মল মনে হয় তখনও মাঝে মাঝে উহা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে দূষিত প্রমাণিত হয়। দূষিত জলে আমরা নিম্নলিখিত নানাপ্রকার ময়লা বা দূষিত জিনিষ দেখিয়া থাকি; এবং বাস্তবিক পক্ষে উহাদের দ্বারাই বিশুদ্ধ জলও দূষিত হয়।

১। **বাহিরের জিনিষ-সমূহ**—বিশুদ্ধ জলের মধ্যেও নানা প্রকার আবর্জ্জনা, লতাপাতা, কাদা, বালি প্রভৃতি বাহিরের জিনিষ পড়িলে ঐ জল দূষিত হয়। এসকল জিনিষ আমরা খালি চোখেই দেখিতে পাই, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষা নিম্নলিখিত অনেক জিনিষই অধিক অপকারী।

২। **রোগজীবাণু**—বিশুদ্ধ জলের মধ্যেও আমাশায়, কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের জীবাণু মিশিয়া গেলে ঐ জল অতিশয় দূষিত হয়। ঐ সকল দূষিত জিনিষ খালি চোখে দেখা যায় না। কাজেই যে জল আমরা অনেক সময় বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা বাস্তবিক

পক্ষে দূষিত থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এক বিন্দু জলের মধ্যেও নানাপ্রকার রোগ-জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। **ধাতব পদার্থ**—জল ভূপৃষ্ঠের উপর বা ভূগর্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় নানাপ্রকার উপাদানের সংস্পর্শে আসিয়া দূষিত হয়। ঐ সকল জিনিষের মধ্যে তামা, অভ্র, সীসা প্রভৃতি নানাপ্রকার খনিজ বা ধাতব পদার্থ প্রধান। উহাদের মধ্যে লৌহ, আইওডিন, ক্যালসিয়ম প্রভৃতি উপকারী এবং অবশিষ্ট প্রায় সকলগুলিই অপকারী।

৪। **গ্যাস**—নানাপ্রকার গ্যাসের সংস্পর্শে জল দূষিত হয়। সাধারণভাবে বলিতে গেলে অক্সিজেন বা অম্লজান ছাড়া প্রায় সকল প্রকার গ্যাসই অনিষ্টকর।

জল কি ভাবে দূষিত হয়

যে সকল দূষিত জিনিষের দ্বারা জল দূষিত হয়, তাহারা নানা ভাবে জলের সংস্পর্শে আসে। মানুষ ও নানা প্রকার জীবজন্তু-দ্বারা এবং কখন কখন জল বিভিন্ন জিনিষের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হওয়ার ফলে, আপনা আপনি দূষিত হয়।

মানুষ—মানুষ অনেক সময় অজ্ঞাতসারে এবং কখনও কখনও অসাবধানতা বশতঃ জলকে দূষিত করে। পানীয় বা অন্য কাজের উদ্দেশ্যে যে জল রাখা হয় তাহাকে ঢাকিয়া না রাখিলে, বা তাহার মধ্যে কোন ময়লা জিনিষ ফেলিলে জল দূষিত হয়। কখন কখন দেখা যায় যে মানুষেরা তাহাদের বাড়ীর সকল

আবর্জ্জনা ও দূষিত পদার্থ পুকুর বা নদীতে ফেলে। জীবজন্তুর মৃতদেহ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাতের মাড় প্রভৃতি কত জিনিষ যে এভাবে জলে পড়িয়া তথায় পচিয়া জলকে দূষিত করে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাছাড়া মানুষ ইচ্ছা করিয়াও অনেক সময় জলকে দূষিত করে। ছোট ছেলেরা জলে (পুকুর, কূপ প্রভৃতিতে) থুথু ফেলে, মল-মূত্র ত্যাগ করে। বয়স্ক লোকেরা জলে ময়লা কাপড় কাচে, বাসন মাঝে, গরু বাছুর স্নান করায়, নিজেরা স্নান করে। এমনিতর বহু উপায়ে জল নষ্ট হয়। তাছাড়া গ্রামের বা সহরের শ্মশান, কবর, ড্রেন, রাস্তা প্রভৃতির ময়লা জল, পায়খানার জল প্রভৃতি গড়াইয়া আসিয়া যাহাতে জল নষ্ট করিতে না পারে সে বিষয়ে অমনোযোগের ফলেও অনেক সময় জল দূষিত হয়।

জীবজন্তু—নানা প্রকার পক্ষী ও পশু জলের মধ্যে বা ধারে মলমূত্র ত্যাগ করে, জলের মধ্যে মুখের খাদ্য-দ্রব্যের কতক অংশ ফেলিয়া দেয় এবং অন্য নানা প্রকার আবর্জ্জনা আনিয়া ফেলে। উহারা স্নান করিবার সময় উহাদের শরীর হইতেও নানা প্রকার ময়লা জলে মিশিয়া থাকে। এই সকল কারণে জল দূষিত হয়।

উদ্ভিদ—গাছপালার পাতা জলে পড়িয়া পচিয়া থাকে, গাছের ছায়াতে অনেক পোকা ডিম পাড়ে। তাছাড়া শেওলা প্রভৃতি জলে জমিয়াও জলকে দূষিত করে।

প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়—ঝড়বৃষ্টি, বালুকা-ঝড় প্রভৃতির ফলে অনেক সময় জল দূষিত হয়, কারণ উহাদের বেগে ধূলি, বালুকা ও অন্য বহু জিনিষ উড়িয়া আসিয়া জলে পতিত হয়।

জলের প্রবাহ—জল ভূপৃষ্ঠের উপর দিয়া (নদী, নালা প্রভৃতির মধ্য দিয়া) বা ভূগর্ভের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হওয়ার সময় নানাপ্রকার ধাতব পদার্থের বাষ্পের বা নানা-প্রকার রোগজীবাণু প্রভৃতি দূষিত জিনিষের সংস্পর্শে আসিয়া দূষিত হয়।

কঠিন ও নরম জল

জল প্রবাহিত হওয়ার সময় ভূপৃষ্ঠ বা ভূগর্ভের খনিজ দ্রব্যসমূহের সংস্পর্শে আসিলে উহাদের কতক অংশ গলিয়া গিয়া ঐ জলের সহিত মিশ্রিত হয়। এরূপ জলকে কঠিন জল (hard water) বলে এবং যে জলে ঐরূপ জিনিষ থাকে না তাহাকে নরম জল (soft water) বলে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে কঠিন ও নরম জলের পার্থক্য জানা যায়।

(১) কঠিন জলে সাবান গুলিলে সহজে ফেনা হয় না, কিন্তু নরম জলে তাহা হয়।

(২) কঠিন জলে খাদ্যদ্রব্য সহজে সিদ্ধ হয় না, কিন্তু নরম জলে তাহা হয়।

(৩) কঠিন জলের স্বাদ ভাল নহে, কিন্তু নরম জলের স্বাদ ভাল।

(৪) কঠিন জলকে অধিক সময় কোন পাত্রে রাখিলে ঐ জলের মধ্য হইতে খনিজ দ্রব্যসমূহ নীচে তলানি পড়ে, কিন্তু

নরম জল কোন কোন পাত্রের উপাদানকে সামান্য পরিমাণে গলাইয়া ফেলে।

কঠিন ও নরম জল যে কেবল কয়েকটি বাহিরের লক্ষণ দ্বারা চিনা যায় তাহা নহে, উহাদের ব্যবহারের ফলাফলও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কঠিন জল ব্যবহারের ফলাফল—

কঠিন জল দীর্ঘ কাল ব্যবহার করিলে ক্ষুধা ও হজম শক্তি কমে। অপরদিকে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ এবং কখন কখন শিরোরোগ ও মূত্র থলিতে পাথুরী রোগ হয়। ঐ জলদ্বারা গায়ে সাবান দিলে সাবান গায়েই লাগিয়া থাকে, অথচ নরম জলে সাবান দিলে তাহা ফেনা হইয়া উঠিয়া যায়। কাপড় কাচিবার জন্যও ঐ জল ব্যবহার করিলে কাপড়ের ময়লা দূর হয় না। তা ছাড়া ঐ জলের মধ্যস্থিত খনিজ দ্রব্যসমূহ পাত্রে জমিতে জমিতে শেষকালে একটি স্তরের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে এঞ্জিনের বয়লার প্রভৃতি যন্ত্র ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে।

এ সম্বন্ধে একটি কথা লক্ষ্য করা দরকার এই যে কোন কোন প্রকার কঠিন জল ফুটাইলে বা অন্য কোন প্রকার প্রক্রিয়া করিলে ঐ জলের কাঠিন্য দূর হয়। এরূপ জলকে অস্থায়ী কঠিন জল (temporarily hard water) বলে; আর যে জলের কাঠিন্য দূর হয় না তাহাকে স্থায়ী কঠিন জল (permanently hard water) বলে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে কঠিন জলকে নরম জলে পরিণত করা হয়। (১) কঠিন জল উত্তপ্ত করিয়া, (২) কঠিন জলের মধ্যে সোডা প্রভৃতি রাসায়নিক

দ্রব্য মিশাইয়া এবং (৩) Jewell water softener নামক যন্ত্রের মধ্য দিয়া কঠিন জলকে ধীরে ধীরে ঢালিয়া দিয়া।

নরম জল ব্যবহারের ফলাফল—

নরম জল ব্যবহার করিলে উপরিলিখিত (কঠিন জল ব্যবহারের) দোষ থাকে না, কিন্তু ঐ জল বায়ু হইতে অঙ্গারাম্লজান সংগ্রহ করে বলিয়া পিতল, তামা, সীসা, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি নির্ম্মিত পাত্রে ঐ জল রাখিলে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে ঐ জল দূষিত হয়। সেজন্যই মাটির পাত্র, কলাই করা বাসন, পাথরের পাত্র প্রভৃতিতে জল রাখিবার ব্যবস্থা অতি উত্তম।

জল সংরক্ষণ

জল আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কিরূপ প্রয়োজনীয় তাহা অনেক সময়ই আমাদের মনে থাকে না। এই জিনিষ সহজে পাওয়া যায় এবং পয়সা দিয়া ইহা কিনিতে হয় না বলিয়াই জল সম্বন্ধে আমরা এতটা উদাসীন। কিন্তু, একথা সত্য যে বিশুদ্ধ জল সকল সময় পাওয়া যায় না এবং উহা উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়াও কষ্টকর। সেজন্যই বিশুদ্ধ জল কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় তাহা আমাদের পক্ষে জানিয়া রাখা দরকার। জল সংরক্ষণ সম্পর্কে প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রথমতঃ বিশুদ্ধ জল যেখানে পাওয়া যায় সেখানে উহাকে সংরক্ষণ করা এবং দ্বিতীয়তঃ উহাকে বাড়ীতে আনিয়া সংরক্ষণ করা।

বিশুদ্ধ জল আমরা নদী, পুকুর ও কূপ হইতে পাইতে পারি। নদী—যে সকল নদীতে সর্ব্বদা জল প্রবাহিত হয় তথাকার জল সহজে দূষিত হয় না, এবং দূষিত হইলেও ঐ জল অন্যত্র প্রবাহিত হইয়া যায় এবং তথায় বিশুদ্ধ জল আসে। তাছাড়া নদীতে প্রচুর পরিমাণ সূর্য্যরশ্মি, বাতাস প্রভৃতি পাওয়া যায় বলিয়া অনেক দোষ নষ্ট হয়। তবে সকল নদীর, বা কোন নদীর সকল অংশের জল সমান বিশুদ্ধ থাকে না। সাধারণতঃ নদীর যে অংশে নিম্নলিখিত লক্ষণ গুলি পাওয়া যায়, তথাকার জল বিশুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হয়।

(১) নদীতে প্রবাহ থাকা চাই (২) নদীর দুই কূলের নিকট অথবা দুই বা ততোধিক নদীর সঙ্গম স্থলের নিকট জল ঘোলা থাকে। সেজন্য নদীর মধ্য ভাগের জল ভাল থাকে; অথবা সঙ্গম স্থল হইতে দূরের জলও বিশুদ্ধ থাকে। (৩) নিকটে শ্মশান, কবর, পায়খানা, নর্দ্দামা প্রভৃতি না থাকে এরূপ ব্যবস্থা চাই। ৪) নদীতে বাঁধ পড়িয়া বা অন্য কারণে গতি মন্থর হইয়া গেলে বা গভীরতা কমিয়া গেলে জল দূষিত হয়। (৫) নদীতে গাছপালা পড়িয়া থাকিলে তাহাদের পাতা পচিয়া বা শৈবাল, আগাছা প্রভৃতি জন্মিয়া জলকে দূষিত করিতে না পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। (৬) নদীতে মাছ থাকা প্রয়োজন। তাহা হইলে উহারা অনেক আবর্জ্জনা ইত্যাদি খাইয়া ফেলিবে। যেখানকার জল পান করার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত সেখানে বা তাহার নিকটে মাছ ধরিতে বা ষ্টীমার, নৌকা ইত্যাদি নঙ্গর

করিয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না। (৭) সহর, বন্দর প্রভৃতি হইতে একটুকু দূরের কোন অংশ হইতেই জল সংগ্রহ করা উচিত, কারণ উহাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বভাবতঃই বহু প্রকার ময়লা ও আবর্জ্জনা জমিয়া থাকে। নৌকা, ষ্টীমার ইত্যাদি বেশী সময় অপেক্ষা করা বা নঙ্গর করিয়া থাকার ফলে নানা কারণে জল দূষিত হয়।

পুকুর—পাড়াগাঁয়ে পুকুরের জল পান, রন্ধন প্রভৃতি সকল কাজে ব্যয়িত হয়। আবার পুকুরের ধারে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, পুকুরের জলে গরু, মহিষ স্নান করান, মানুষের স্নান করা, সাঁতার কাটা, মাছ ধরা ইত্যাদি কত কাজ যে হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেজন্যই পুকুরের জল সহজে দূষিত হয় এবং তাহার ফলে সহজেই বহু লোকের বিপদ হয়। একারণেই পুকুরেব জল সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। সংরক্ষিত জলের পুকুরকে সাধারণতঃ Reserved Tank বলে।

ঐ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। (১) পুকুরটি মানুষের বাড়ীঘর, বাগান, পায়খানা, গোশালা প্রভৃতি হইতে দূরে হইবে। (২) উহাতে যাহাতে সর্ব্বদা প্রচুর সূর্য্য-কিরণ পতিত হয় তাহার জন্য চারিদিক বহুদূর খোলা থাকিবে। (৩) পুকুরের চারি পাড় চারিদিকের স্থানসমূহ হইতে অনেক উঁচু থাকিবে এবং তথা হইতে চারিদিকে ঢালু হইয়া যাইবে, যাহাতে বাহিরের কোনরূপ দূষিত জল তথায় আসিতে না পারে। বরং পুকুরের পাড়ের বাহির দিকের ও চারিদিকের বৃষ্টির ঘোলা জল প্রভৃতি দূরের দিকে গড়াইয়া যাইতে পারে। (৪) পুকুর

যাহাতে বেশ বড় ও গভীর হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত, নতুবা গ্রীষ্মকালে জল কমিয়া যাইতে পারে ও উহা নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। (৫) পুকুরে কিছু মাছ যাহাতে থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবে কারণ তাহারা ময়লা, পোকা প্রভৃতি খাইয়া ফেলে ; অপরদিকে পুকুরে যাহাতে শেওলা প্রভৃতি জন্মিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে। (৬) মাঝে মাঝে পুকুরের পাঁক তুলিয়া ফেলিতে হইবে। (৭) পুকুরের জল তুলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘাট ও বালতি থাকিবে এবং তাহা দ্বারা জল উপরে তুলিয়া পরে সকলে নিজ নিজ পাত্রে ঢালিয়া লইবে। (৮) ঐরূপ পুকুরে কেহই কোন কারণে স্নান করা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কোন কাজ করিতে পারিবে না। (৯) পুকুরের চারিপাশে একটু উঁচু দেওয়াল তুলিয়া দিতে পারিলে খুব ভাল হয়। (১০) পুকুরের জলে কোন প্রকার দোষ দেখা দিলেই পার্মাঙ্গেনেট অব পটাশিয়াম, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি প্রতিশেধক ঔষধ দিয়া বিশোধন করিতে হইবে।

কূপ—নলকূপ ও বাঁধান কূপই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। উহাদের সম্পর্কে Reserved Tank-এর মত প্রায় সকল ব্যবস্থা করা দরকার। নিম্নলিখিত কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত।

(১) কূপ যত গভীর হইবে ততই ভাল। অল্প গভীর কূপের জল শুকাইয়া যায়। (যাহাতে অন্ততঃ একটি অপ্রবেশ্য স্তর ভেদ করিয়া ও নীচের দিকে গভীর করা হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।) (২) কূপের উপর দিকের কতক অংশ বাঁধাইয়া

দিতে হইবে নতুবা চারিদিকের ময়লা জল সহজে কূপে প্রবেশ করিতে পারে। (৩) কূপের চারিদিকে উঁচু করিয়া বাঁধাইয়া দিবে এবং ঢাকনি দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে জল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা কমিয়া যায়। (৪) জল তুলিবার জন্য বালতি, শিকল ও কপিকলের ব্যবস্থা করা উচিত। (৫) কূপের চারিপাশ বাঁধাইয়া দিয়া তথা হইতে চারিদিকে ঢালু রাখিবে এবং একটি পাকা ড্রেনের দ্বারা যাহাতে জল দূরে সরিয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

জল সংগ্রহ সম্পর্কে উপরিলিখিত বিষয়ে মনোযোগ দিলেও কখন কখন বাড়ীতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা ভাল না থাকিলে জল দূষিত হইয়া থাকে। কাজেই প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাড়ীতে জল সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করা উচিত। অনেক বাড়ীতেই কেবল মাত্র পান করার জল সংরক্ষিত হয়; রন্ধন, বাসন মাজা প্রভৃতি অন্যান্য কাজের জন্য ব্যবহৃত জলদ্বারাও যে নানাপ্রকার রোগ হইতে পারে তাহা কতক লোক বুঝিতেই চাহেন না।

বাস্তবিক পক্ষে সকল দিক বিবেচনা করিতে গেলে, প্রত্যেক কাজের জন্যই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জল সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পানীয় জল মাটীর পাত্রে রাখিলে সহজে শীতল হয়, কিন্তু ঐ পাত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। কাজেই কুঁজাতে অধিক দিন জল রাখা ভাল নহে। কারণ উহার ভিতর দিক মাজিয়া পরিষ্কার করা যায় না। মাঝে মাঝে উহাকে রৌদ্রে দিবে এবং কিছু দিন পরে নূতন কুঁজা ব্যবহার করিবে। রন্ধন, স্নান প্রভৃতি কাজের জন্য

ব্যবহৃত জলও সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। পাত্রে কখনও হাত, আঙ্গুল বা নখ ডুবাইবে না; এবং সর্ব্বদা পরিষ্কার গ্লাসে বা অপর কোন পাত্রে জল ঢালিয়া পান ও রন্ধনাদি করিবে। স্নানের জলের চৌবাচ্চা প্রভৃতিও সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা বাহিরের নানা প্রকার আবর্জ্জনা ঐ সকল স্থানে পড়িয়া জল নষ্ট হয়। সকল পাত্র, চৌবাচ্চা প্রভৃতিও কিছু কাল পর পর পরিষ্কার করা উচিত।

জল দ্বারা সংক্রামিত ব্যাধি

জল নানা প্রকার রোগের জীবাণু বহন করিয়া লয়। ঐরূপ জীবাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ লাভ করিলে উক্ত ব্যক্তির দেহে ঐ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেজন্যই জলদ্বারা যে সকল রোগ সংক্রামিত হইয়া থাকে তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে জলের মধ্যে ঐরূপ রোগের জীবাণু খুব বেশী পরিমাণে ছিল। যথা—

(১) খনিজ পদার্থ—জলের মধ্যে সীসা, তামা, দস্তা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ অধিক পরিমাণে থাকিলে ঐ জলকে কঠিন জল বলে। কঠিন জল অধিক দিন ব্যবহার করিলে অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা, গলগণ্ড, প্রভৃতি বহু রোগের সৃষ্টি হয়।

(২) উদ্ভিজ্জ পদার্থ—জলের মধ্যে গাছ, লতা, পাতা প্রভৃতি পচিয়া থাকিলে জল দূষিত হয়। ঐরূপ জল ব্যবহারের ফলে নানা প্রকার পেটের পীড়া হয়।

(৩) জান্তব পদার্থ—জলের মধ্যে কোন প্রকার জীবজন্তুর দেহ বা দেহের কোন অংশ পড়িয়া পচিলে জল দূষিত হয়। ঐ জল ব্যবহার করিলে কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ হয়।

(৪) রোগের জীবাণু—জলের মধ্যে কখন কখন কৃমি, কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি নানাপ্রকার রোগের জীবাণু থাকে। ঐ জল ব্যবহার করিলে ঐ সকল রোগ হয়।

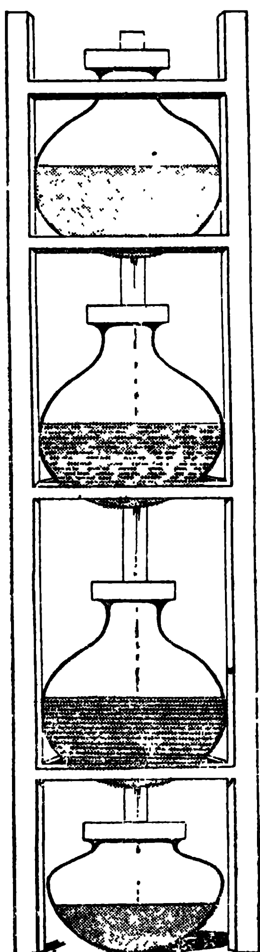
(৫) দূষিত বাষ্প প্রভৃতি—কখন কখন জলের মধ্যে এমোনিয়া প্রভৃতি দূষিত বাষ্প, দুর্গন্ধযুক্ত নানাপ্রকার জিনিষ থাকে। ঐরূপ জল ব্যবহারের ফলে নানাপ্রকার পেটের পীড়া হয়।

জল পরিশুদ্ধি

দূষিত জলকে নানা উপায়ে পরিশোধন করা যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়-সমূহ সমধিক প্রচলিত।

ফিল্টার—জল হইতে ময়লা-সমূহ ছাকিয়া ফেলাকেই (filter) করা বলে। পুরু কম্বল, ফ্লানেল বা সাধারণ কাপড়কে কয়েক ভাঁজ করিয়াও তাহা দ্বারা ময়লা জলকে ছাঁকিয়া ফেলিলে কিছু কিছু ময়লা দূর হয়। কিন্তু তাহা দ্বারা জল সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত হয় না। সেজন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে জল ফিল্টার করা হয়। এই সকল উপায়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি দ্বারা সামান্য পরিমাণ জল পরিশোধন করা যায়। অধিক পরিমাণ জল পরিশুদ্ধি করিতে হইলে চতুর্থ উপায় অবলম্বন করা হয়।

(১) **কলসী ফিল্টার**—এই উপায়ে জল পরিশুদ্ধি একটি প্রাচীন নিয়ম এবং যদিও আজকালও কখন কখন উহার ব্যবহার দেখা যায়, তথাপি উহা নির্ভরযোগ্য নহে ; কারণ এভাবে ফিল্টার করার ফলে জল জীবাণু শূন্য হয় না। একেবারে ফিল্টার না করা, বা অন্য কোন উপায়ে বিশোধন না করা অপেক্ষা, ইহা 'মন্দের ভাল' হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই উপায়ে ফিল্টার করিবার জন্য চারিটি কলসীকে একটির উপর অপরটিকে বসাইতে হয়। উপরের তিনটি কলসীর নিম্নভাগে একটি ছিদ্র রাখিবে এবং তথায় এরূপ ভাবে ন্যাকড়া, পাট বা অন্য জিনিষ রাখা হয় যেন প্রত্যেক কলসী হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল নীচের কলসীতে পড়ে। সকলের উপরের কলসীতে জল, দ্বিতীয়টিতে বালি এবং তৃতীয়টিতে কাঠকয়লা রাখিবে। তাহা হইলে প্রথম কলসীর জল বালি ও কাঠ কয়লার মধ্য দিয়া আসিয়া সর্ব্বনিম্ন কলসীতে জমা হইবে।



কলসী ফিল্টার

(২) **বার্কফেল্ড ফিল্টার**—এই যন্ত্রটি আধুনিক এবং ইহার মধ্যে চীনামাটি বা পোর্সেলেনের তৈরী এমন একটি জিনিষ (Vital) থাকে যাহার মধ্য দিয়া জল নীচের দিকে চুয়াইয়া যাইবার সময় সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের উপর দিকে জল ঢালিয়া দিলে ধীরে ধীরে জল চুয়াইয়া নীচে গিয়া জমে এবং ঐ বিশুদ্ধ জল পরে নির্ভয়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই যন্ত্র ডাক্তারখানা হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থের বাড়ী পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছে।

(৩) **পাস্তুর-চেম্বারল্যাণ্ড ফিল্টার**—এই যন্ত্রটি অনেক পরিমাণে বার্কফেল্ড ফিল্টারের মত। ইহাদ্বারাও অল্প পরিমাণ জল বিশোধন করা হইয়া থাকে।

(৪) **শহর বন্দর প্রভৃতির** জন্য অধিক পরিমাণ জল প্রয়োজন। উপরিলিখিত (তিনটির মধ্যে) কোন নিয়মে প্রচুর পরিমাণে জল পরিশোধন করা যায় না। সেজন্য ঐরূপ স্থানের প্রয়োজন অনুযায়ী বিশুদ্ধ জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করা হয়। কোন নদী বা প্রকাণ্ড জলাশয় হইতে পাম্পের সাহায্যে জল আনিয়া ফটকিরি দিয়া ঐ জলকে ২।৩ দিন পর্য্যন্ত কোন বড় ট্যাঙ্ক বা চৌবাচ্চাতে রাখিয়া দেওয়া হয়। তারপর ঐ সামান্য পরিষ্কৃত জলকে ফিল্টার বেড (Filter bed) নামক অপর বড় চৌবাচ্চা বা ট্যাঙ্কে আনা হয়। তথায় জল প্রথমে এক স্তর সরু বালি, তার নীচে এক স্তর মোটা বালি, তার নীচে এক স্তর নুড়ি ও সকলের নীচে এক স্তর বড় পাথরের টুকরা

বা ইটের মধ্য দিয়া চুয়াইয়া আসিয়া সকলের নীচে জমিয়া থাকে। সুতরাং এই নিয়মটি কতকটা কলসী ফিল্টারের মত (কিন্তু ইহাতে ফটকিরি মিশান হয় এবং শহরে কোন প্রকার রোগ বিস্তৃত হইলে ক্লোরিন বা অন্য জীবাণু-নাশক ঔষধ মিশান হয়)। কলিকাতার নিকটে ফলতা নামক জায়গায় গঙ্গার জল তুলিয়া এবং ঢাকার নিকট বুড়ীগঙ্গা নদী হইতে জল তুলিয়া এই উপায়ে ফিল্টার করা হয়। এই ভাবে যে জল বিশোধন করা হয় তাহা পরে পাম্প্ করিয়া নলের সাহায্যে শহরের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করা হয়। ইহাই **কলের জল** (Pipe water) নামে পরিচিত।

উপরিলিখিত যে কোন উপায়ে ফিল্টার করা ছাড়াও অন্যান্য নানা উপায়ে জল পরিশোধন করা হয়। যথা—

থিতান—পুকুর, কূপ, নদী প্রভৃতির জল কোন পাত্রে অধিক কাল এক অবস্থায় রাখিয়া দিলে তাহার ময়লাসমূহ নীচে জমিয়া থাকে। ইহাকেই থিতান বা Sedimentation বলে। থিতানর জন্য পাত্রটি বড় হওয়া দরকার এবং পাত্রটি এরূপভাবে রাখা উচিত যাহাতে উহাতে প্রচুর সূর্য্যের উত্তাপ পতিত হয়। তাহা হইলে ঐ উত্তাপে জলের মধ্যস্থিত জীবাণু কিছু পরিমাণে মরিয়া যাইবে। ঐ জলে ফটকিরি মিশাইয়া দিলে ময়লাসমূহ তাড়াতাড়ি নীচে থিতাইয়া যায়। এইরূপ জল অনেকটা নির্ম্মল হইলেও সম্পূর্ণরূপে রোগজীবাণু শূন্য হয় না।

ফুটান—জলের মধ্যস্থিত জীবাণু সম্পূর্ণভাবে দূর করিতে হইলে

ঐ জলকে ভাল ভাবে ফুটান দরকার। থিতান জলকে ঐ ভাবে ফুটাইলে উহার মধ্যে কোন দোষ থাকে না এবং তাহাকেই **নির্দ্দোষকরণ** বা Sterilisation বলে। জলকে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা না ফুটাইলে উহার মধ্যস্থিত জীবাণু সম্পূর্ণরূপে মরিয়া যায় না। ফুটান জল পান করিতে অনেকেই ভালবাসেন না। কারণ জল ফুটানর ফলে জলের মধ্য হইতে বায়ু বাহির হইয়া গিয়া ঐ ফুটান জল বিস্বাদ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ জলকে মাটির কলসীতে ঢালিয়া রাখিয়া ১০।১২ ঘণ্টা পরে উহা পান করিলে আর বিস্বাদ লাগে না। কারণ ফুটান জল কিছুকাল মাটির কলসীতে রাখিলে, ফুটানর ফলে যে পরিমাণ বায়ু জল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরায় সেই ঠাণ্ডা জলে মিশিয়া উহার বিস্বাদ ভাবটাকে দূর করে।

চোলাই-করণ—জল ফুটাইয়া সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ করাকে চোলাই-করণ বা Distillation বলে। একটি পাত্রের মধ্যে জলকে ফুটাইলে তাহা হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয় তাহাকেই পুনরায় শীতল করিয়া জলে পরিণত করা যায়। এই উপায়ে যে জল পাওয়া যায় তাহা ঔষধ তৈয়ার করার কাজেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়।

রাসায়নিক উপায়ে বিশোধন—নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য (Chemicals) মিশাইয়া জলকে পরিশোধন করা হয়। (১) ফটকিরি মিশাইলে জলের মধ্যস্থিত ময়লাসমূহ কিছুক্ষণের মধ্যেই নীচে জমিয়া থাকে। (২) পটাশিয়াম পারমেঙ্গেনেট,

আইওডিন, ব্লীচিং পাউডার, চূণ প্রভৃতি মিশাইয়া জলকে জীবাণুশূন্য করা যায়। (৩) কোন স্থানে কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি রোগ প্রসার লাভ করিলে জলের সহিত ক্লোরিন (Chlorine), ক্লোরোজেন (Chlorogen) প্রভৃতি মিশাইয়াও জলকে নির্দ্দোষ করা হয়। সাধারণ চূণ মিশাইলেও জল অনেক পরিমাণে নির্দ্দোষ হয়।

সাজসজ্জা

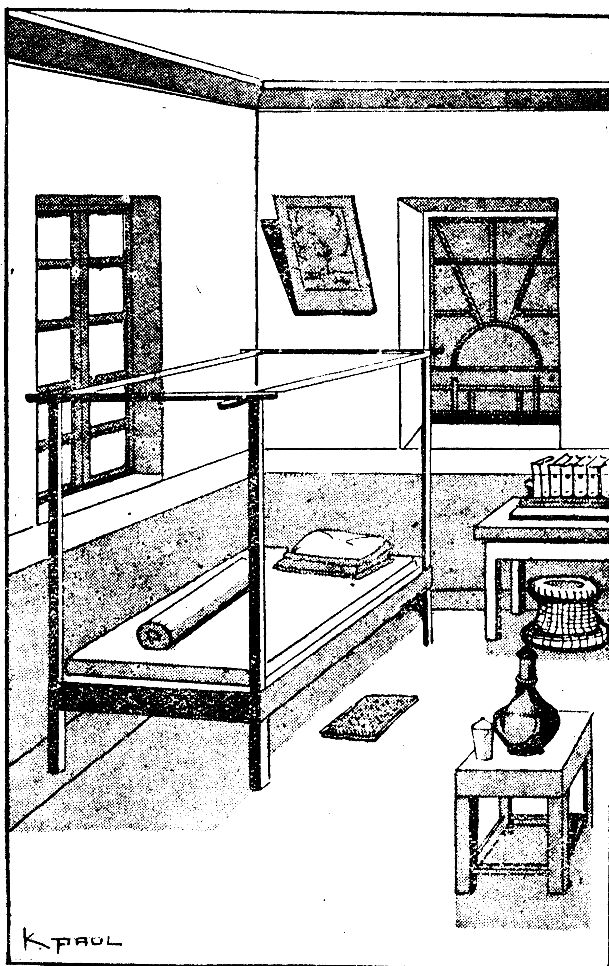
প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন নিজ নিজ দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি কামনা করে তেমনই নিজ নিজ বাড়ীঘরের সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি করিতে চায়। ঘরের বা বাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

গৃহের সরঞ্জাম ও সাজসজ্জা

বাড়ীর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কেবলমাত্র বাসগৃহ বা ঘরের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না। বাড়ীর বাগান, উঠান প্রভৃতিও যাহাতে সুন্দর ভাবে সাজান থাকে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তারপর বাড়ীর ঘরদরজার বিষয়। ঘরগুলিতে উপযুক্ত পরিমাণ আসবাবপত্র না থাকিলে কাজের অসুবিধা হয়, আবার অধিক পরিমাণে আসবাবপত্র থাকিলেও অসুবিধা হয়। যথা,

বিছানার জন্য খাট, তক্তপোষ প্রভৃতি, বসিবার জন্য চেয়ার, লেখাপড়ার জন্য টেবিল প্রভৃতি জিনিষ প্রয়োজন মত না থাকিলে যেমন অসুবিধা হয়, তেমনি আবার ঘরময় কতকগুলি চেয়ার টেবিল প্রভৃতি আসবাবপত্র ছড়ান থাকিলে নড়াচড়ার অসুবিধা ঘটে, বা তাহাদের নীচে আবর্জ্জনা প্রভৃতি সহজেই জড় হইতে পারে। দেওয়ালে কোন ছবি না থাকিলে যেমন ফাঁকা বোধ হয়, বা অনেক সময় মানসিক শান্তিরও বিঘ্ন হয়; তেমনি দেওয়ালে অনেক ছবি জড় হইলে উহা দৃষ্টিকটু হয়। এ সকল বিষয় বি-বচনা করিয়া প্রত্যেক বাড়ীতে ঠিক প্রয়োজন মত আসবাবপত্র রাখা উচিত।

বসিবার ঘরে কয়েকখানা টেবিল, চেয়ার; শয়ন ঘরে খাট, তক্তপোষ প্রভৃতি ও ছোট একখানা টেবিল, চেয়ার; রান্নার ঘরে রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র ইত্যাদি যেখানে যে জিনিষ প্রয়োজন তাহাই রাখা উচিত। শয়নঘরে অতিরিক্ত জিনিষ যাহাতে কিছুতেই না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা উচিত। ঘরের মধ্যে এক-দিকে যেমন কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ রাখিবার ব্যবস্থা করা দরকার, অপর দিকে তেমনই সেগুলিকে সাজাইয়া রাখা দরকার। কয়েকটি মাত্র জিনিষ একস্থানে জড় করিয়া রাখিলে যথেষ্ট অসুবিধা ও অপকার হইতে পারে। গৃহের সাজসজ্জা সত্যই মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। ঘরের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় জিনিষ, ছবি, পর্দ্দা, কার্পেট প্রভৃতি এমন ভাবে রাখা উচিত যাহাতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য উভয়েরই বৃদ্ধির পক্ষে সাহায্য হয়।



আদর্শ শয়ন-কক্ষ　　　পৃঃ ৫২

পরিচ্ছন্নতা

বাড়ীর উঠান, বাগান হইতে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। বাহিরের আবর্জ্জনা-স্তূপ যাহাতে কিছুতেই জমিয়া না থাকে তাহার ব্যবস্থা করা যেমন দরকার, তেমনই ঘরের ভিতরে যাহাতে ঝুল জমিয়া থাকিতে না পারে বা কোন আসবাবপত্রে ময়লা পড়িতে না পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা উচিত। বাড়ীর উঠান, বাগান প্রভৃতি প্রত্যহ ঝাঁট দেওয়া, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মুছিয়া ফেলা, বাসনপত্র ধুইয়া ফেলা, কাঠের সাজসজ্জা, ছবি প্রভৃতি প্রত্যেকটি জিনিষ যাহাতে নিয়মিত ভাবে মুছিয়া পরিষ্কার করা হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। অনেক বাড়ীতে ঘরের কোণে ঝুল, ছবির উপরে বা পিছনে ময়লা অনেক সময়ই দেখা যায়। কিন্তু একটু সতর্ক হইয়া ঐ সকল স্থান ও জিনিষপত্র নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করিলে ঘর-দুয়ারে ময়লা জমিতে পারে না।

নিরাপত্তা

ঘরের সাজসরঞ্জামের নিরাপত্তার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রত্যেকটি জিনিষ যাহাতে সুন্দর ও আরামদায়ক হয় তাহা যেমন দেখা দরকার, তেমনই তাহাদের নিরাপত্তাও লক্ষ্য করা উচিত। খুব হালকা কাঠের আসবাবপত্র সুন্দর বা আরামদায়ক হইলেও সেগুলি বিপজ্জনক। সেইরূপ আবার অনেক কাচের জিনিষ

সুন্দর হইলেও প্রতি মুহূর্ত্তে সেগুলি ভাঙ্গিবার আশঙ্কা থাকে এবং তাহার ফলে হাত পা কাটিয়া বা অন্যভাবে বিপদের ভয় থাকে। ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা প্রয়োজন এবং তাহাদিগকে এরূপভাবে সাজাইয়া রাখা উচিত যেন কেহ অসাবধানতা বশতঃ সহজে তাহাদের উপরে পড়িতে না পারে বা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে না পারে। তাছাড়া জিনিষপত্রের ব্যবহার সম্বন্ধেও খুব সতর্কতা প্রয়োজন। অনেক সময় বাড়ীর লোকেদের অসাবধানতা বশতঃ বহু জিনিষ ভাঙ্গিয়া যাইতে দেখা যায়। কাচ, পাথর, মাটি প্রভৃতি নির্ম্মিত জিনিষই যে কেবল ভাঙ্গে তাহা নহে। কাঁসা, পিতলের থালা বাসন প্রভৃতিও যত্ন করিয়া না রাখিলে ভাঙ্গিয়া যায়। কাঠের জিনিষও অসাবধানতা বশতঃ ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। জিনিষপত্র পুরাতন হইলেও তাহাদের ব্যবহার সম্পর্কে সাবধান হওয়া উচিত, কারণ পুরাতন জিনিষ একটু আঘাতেই নষ্ট হইতে পারে।

নর্দ্দমা

মানবদেহের পক্ষে যেরূপ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই চলে না, নিয়মিত ভাবে মলমূত্র প্রভৃতি ত্যাগ, ঘর্ম্ম নিঃসরণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন— তেমনই বাসগৃহের সম্বন্ধেও স্থান নিরূপণ, বায়ু চলাচল, সাজসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ছাড়া আবর্জ্জনাদি পরিষ্কারের সুব্যবস্থাও একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক ঘরে বা বাড়ীতে

কিছু না কিছু আবর্জ্জনা জমিবেই। সেগুলি যাহাতে জড় হইয়া বা পচিয়া বাড়ী অস্বাস্থ্যকর করিতে না পারে সে উদ্দেশ্যে প্রথমেই বাড়ীর আবর্জ্জনাদি দূর করিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

ময়লা ও আবর্জ্জনা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যথা—

শুষ্ক আবর্জ্জনা—ভাঙ্গা আসবাবপত্র, তরকারীর খোসা, মাছের আঁইস, কাঁটা প্রভৃতি, পশুর চর্ম্ম, অস্থি প্রভৃতি, ধূলা বালি প্রভৃতি নানা প্রকার আবর্জ্জনা প্রত্যেক বাড়ীতেই দেখা যায়।

তরল ময়লা—জীবজন্তুর মলমূত্র, কফ, শৌচের জল প্রভৃতি নানাপ্রকার তরল জিনিষ ও উহাদের সহিত মিশ্রিত অন্যান্য আবর্জ্জনা সর্ব্বত্র দেখা যায়।

অন্যান্য প্রকার ময়লা—উপরিলিখিত দুই প্রকার আবর্জ্জনা ছাড়া গ্রাম অঞ্চলে এবং শহরাদিতে নানাপ্রকার জীবজন্তুর মৃতদেহ, গাছপালার পাতা, ভাঙ্গা জিনিষপত্র প্রভৃতি আবর্জ্জনা জমিতে দেখা যায়।

আবর্জ্জনা অপসারণ

প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে শুষ্ক ও তরল নানাপ্রকার আবর্জ্জনা জমা হয়। গ্রাম, শহর প্রভৃতিতে এরূপ বিভিন্ন লোকের বাড়ী হইতে নিঃসৃত একত্রিত ময়লার বিরাট স্তূপ দেখা

যায়। তাছাড়া কতক ময়লা কোন লোক বিশেষের বাড়ী হইতে না আসিলেও শহর বা গ্রামের সাধারণের ব্যবহৃত স্থানে সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। সুতরাং আবর্জ্জনা অপসারণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

(১) প্রত্যেক ব্যক্তির বাড়ী হইতে আবর্জ্জনা অপসারণ ;

(২) গ্রাম হইতে আবর্জ্জনা অপসারণ ;

(৩) শহর, বন্দর হইতে আবর্জ্জনা অপসারণ।

প্রত্যেক ব্যক্তির বাড়ী হইতে ময়লা অপসারণ সম্বন্ধে আবার দুইটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ নিজ বাড়ীর সর্ব্বপ্রকার ময়লা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্রিত করিয়া রাখা এবং দ্বিতীয়তঃ যাহাতে অন্য কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট বা অসুবিধা না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা। প্রত্যেক বাড়ীতে শুষ্ক ও তরল নানাপ্রকার ময়লা থাকে। প্রত্যেক লোকের আপন আপন বাড়ীতে ঐ সকল ময়লা জিনিষ বাড়ীর বাহিরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা করা উচিত এবং যেখানে তাহা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করিয়া দূরে লওয়ার ব্যবস্থা থাকে সেখানে ময়লা লওয়ার পর মাঝে মাঝে চূণ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। আর যেখানে তাহা লওয়ার ব্যবস্থা নাই সেখানে মাঝে মাঝে ময়লাসমূহ পুড়াইয়া ফেলিবার বা মাটীর নীচে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ

এই সকল ময়লা এমন কোন স্থানে ফেলা উচিত নহে যেখান হইতে ঐ ময়লার সমস্তটা বা খানিকটা অংশ গড়াইয়া জলের সহিত বা অন্য উপায়ে কোন কূপ, পুকুর ইত্যাদিতে যাইয়া পড়িতে পারে। এই সকল ময়লা যাহাতে কোনও উপায়ে অপর লোকের পক্ষে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি না করে তাহা লক্ষ্য করা উচিত। অনেক সময় একের বাড়ীর ময়লা অন্যের পুকুরে গিয়া পড়ে, বা পচিয়া অন্যের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। ঐ বিষয়ে সকলেরই বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

গ্রামের আবর্জ্জনা অপসারণ সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা এই যে গ্রামের আবর্জ্জনা বাহিরে লইয়া ফেলিবার কোন উপায় নাই। তথায় ড্রেন বা রাস্তা এতই খারাপ যে ময়লা কোন উপায়েই বাহিরে লওয়া যায় না। সুতরাং গ্রামের ময়লা গ্রামেই থাকিতে বাধ্য। সেজন্য এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার যাহাতে সকল ময়লা পুড়াইয়া ফেলা যায়, মাটীতে পুঁতিয়া রাখা যায় বা অন্য কোন উপায়ে নষ্ট করিয়া ফেলা যায়।

শহরের আবর্জ্জনা অপসারণ এক বিষয়ে গ্রামের চেয়ে সুবিধাজনক, কারণ শহরে ড্রেন, পথঘাট ইত্যাদির ব্যবস্থা অনেক ভাল। কাজেই শহর হইতে ময়লাসমূহ সহজে দূরে লওয়া যায়। কিন্তু শহরের এক বিষয়ে অসুবিধা অনেক বেশী। কারণ শহরে গ্রামের চেয়ে অনেক বেশী লোক বাস করে এবং বহুগুণে বেশী ময়লা জমে। ময়লা বেশী হইলেও শহরের

লোকেরা ময়লা অপসারণ সম্বন্ধে অনেক বেশী মনোযোগী এবং শহরের আবর্জ্জনা অপসারণের ব্যবস্থাও সাধারণতঃ খুব ভাল। শহরের ময়লাসমূহ বাহিরে লইয়া পুড়াইয়া ফেলার বা পুঁতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। কখন কখন ঐ সকল ময়লা নিকটবর্ত্তী নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ব্যবস্থার ফলে শহরের সুবিধা হইতে পারে, কিন্তু যাহাতে অন্য গ্রামের বা নদীর নিকটবর্ত্তী স্থানের কোন অনিষ্ট না হয় তাহাও বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করা দরকার।

শুষ্ক ও তরল ময়লা নিষ্কাশন

আবর্জ্জনাসমূহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—শুষ্ক ও তরল। শুষ্ক আবর্জ্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা তরল ময়লা অপসারণের ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তরল আবর্জ্জনা অপসারণের জন্য নর্দ্দমা, নালা প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয়, আবার শুষ্ক আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য কোন প্রকার গাড়ীর সাহায্য লওয়াই বিধেয়।

তরল ময়লা ফেলিবার জন্য প্রত্যেক লোকের বাড়ীতে নালা, নর্দ্দমার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঐ সকল নালা এরূপ ঢালু হইবে যেন উহাদের মধ্য দিয়া জলের সহিত ময়লা সহজে নামিয়া যাইতে পারে। বাড়ী হইতে তরল ময়লা নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন যত অধিক সংখ্যক হয় ততই ভাল, কারণ তরল ময়লা নিষ্কাশনের ড্রেন কম হইলে বাড়ীর সকল স্থানের ময়লা

সহজে উহাদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। ড্রেন-সমূহ পাকা বা বাঁধান হইলেই ভাল, কারণ ঐরূপ ড্রেন পরিষ্কার করা সহজ এবং উহাদের মধ্য দিয়া দূষিত জীবাণু অন্যত্র সহজে চুয়াইয়া যাইতে পারে না। ঐ সকল ড্রেন নিয়মিত ভাবে ব্রুশ, জল প্রভৃতি দ্বারা ধোয়াইয়া পরিষ্কার করা উচিত এবং মাঝে মাঝে ফিনাইল, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি দিয়া শোধন করা বিশেষ দরকার।

প্রত্যেক লোকের বাড়ী হইতে বিভিন্ন নালা-নর্দ্দমার মধ্য দিয়া যে ময়লা জল প্রভৃতি বাহিরে আসে তাহা অপসারণের জন্য গ্রাম বা শহরে বড় বড় ড্রেন বা নর্দ্দমা থাকা দরকার। গ্রামের বা ছোট শহরের ড্রেন সাধারণতঃ কাঁচা থাকে। ঐ সকল ড্রেন তৈয়ার করিতে খরচ কম হইলেও ঐগুলি সহজেই নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ময়লা অপসারণ সম্বন্ধে অনেক অসুবিধা হয়। ঐ সকল ড্রেনের ঢালু দিক অনেক সময় বুজিয়া যায়, উপরের মাটী, বালি প্রভৃতি জমিয়া ড্রেন জল চলাচলের পক্ষে অসুবিধা-জনক হইয়া পড়ে। সেজন্য গ্রামের জন্যও পাকা ড্রেনের ব্যবস্থা করাই ভাল। অবশ্য যতদিন পর্য্যন্ত সেরূপ ব্যবস্থা করা না যায়, ততদিন কাঁচা ড্রেন নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করিবার ও উহাদিগকে কাজের উপযোগী রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ঐ সকল ড্রেন হইতে মাঝে মাঝে মাটী, কাদা প্রভৃতি তুলিয়া ফেলা, ধার বাঁধিয়া দেওয়া এবং জল নিষ্কাশনের অপরাপর ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

পাকা ড্রেন তৈয়ার করিতে খরচ বেশী হইলেও উহাতে পরে লাভ বেশী হয়। ঐরূপ ড্রেনে নিয়মত ভাবে জল ঢালিয়াই পরিষ্কার করা চলে। তবে মাঝে মাঝে চূণ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি দিলে খুবই ভাল হয়। শহরের ড্রেনসমূহ মিউনিসিপ্যালিটি দ্বারা এবং গ্রামের ড্রেনসমূহ ইউনিয়ন বোর্ড, লোক্যাল বোর্ড প্রভৃতি দ্বারা তৈয়ার ও মেরামত করা হয়। এ বিষয়ে জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি থাকিলে কাজ খুব ভাল হয়।

শুষ্ক আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে ভাঙ্গা ঝুড়ি, টিন, বালতি প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ বাড়ীর শুষ্ক আবর্জ্জনাসমূহ ঐরূপ কোন না কোন পাত্রে জমা করিয়া রাখা হয়। পল্লীগ্রামে সেগুলিকে পরে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া পুড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলিলে ভাল। শহরে শুষ্ক আবর্জ্জনা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অন্যরূপ। তথায় প্রত্যেক বাড়ী হইতে ঐ সকল জিনিষ আনিয়া বাহিরে কোথায়ও নির্দ্দিষ্ট পাত্রে (dustbin) জড় করা হয়। তারপর ময়লা ফেলিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ীতে (ছোট শহরে ঘোড়ার গাড়ী, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি শহরে মোটর লরী) ঐ সকল ময়লা তুলিয়া লইয়া শহর হইতে দূরে কোন স্থানে পুঁতিয়া ফেলা হয় বা পোড়াইবার ব্যবস্থা হয়। ঐ সকল জিনিষ মাটীতে পুঁতিয়া রাখিলে তথায় ঐগুলি পচিয়া মাটীর সহিত মিশিলে উত্তম সারের সৃষ্টি হয়। মানুষ এবং জীবজন্তুর মল হইতেও ঐ ভাবে উত্তম সার তৈয়ার হয়।

প্রত্যেক লোকের বাড়ী হইতে, পল্লীগ্রাম হইতে এবং শহর

হইতে **বিভিন্ন প্রকার ময়লা অপসারণ** সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

প্রত্যেক বাড়ীতে তরল ময়লা অপসারণের জন্য উপযুক্ত ড্রেন থাকিবে। ড্রেনসমূহ যথাসম্ভব পাকা হইবে। ড্রেনগুলি পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং ড্রেনগুলি এরূপ ঢালু হইবে যেন সহজেই বাড়ীর সমস্ত আবর্জ্জনা বাহিরে চলিয়া আসে। ঐ সকল ড্রেনের মিলিত ময়লা যাহাতে বড় ড্রেনের মধ্য দিয়া লোকালয় হইতে আরও দূরে চলিয়া যাইতে পারে ঐ উদ্দেশ্যে গ্রাম বা শহরের বড় ড্রেনের সহিত উহাদিগকে সংযুক্ত করিতে হইবে। ড্রেন-সমূহকে পরিষ্কার রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রত্যেক বাড়ীর শুষ্ক আবর্জ্জনাসমূহ কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে জড় করিয়া রাখিতে হইবে। যে সকল ময়লা নানা স্থানে ছড়াইয়া থাকে, তাহাদিগকে কুড়াইয়া আনিয়া ঐ স্থানে রাখিতে হইবে। নতুবা ঐগুলি এদিকে ওদিকে উড়িয়া যাইবে ও পচিয়া বায়ুকে দূষিত করিবে। ড্রেন, আবর্জ্জনা ফেলিবার পাত্র প্রভৃতিতে মাঝে মাঝে চূণ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি দিবে। বাড়ীর শুষ্ক আবর্জ্জনা-সমূহ কিছু কাল পরেই দূরে লইয়া পুঁতিয়া বা পুড়াইয়া ফেলিবে, অথবা যেখানে গাড়ী করিয়া দূরে লওয়ার ব্যবস্থা আছে তথায় এমন কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে আবর্জ্জনা আনিয়া রাখিবে যেখান হইতে নিয়মিত ভাবে সেই আবর্জ্জনা-স্তূপ অপসারিত হইতে পারে।

গ্রামের তরল ময়লা কোন নদী, ডোবা বা অন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে বড় ড্রেন রাখিবে। ঐ ড্রেনের

মধ্য দিয়া যাহাতে সকল বাড়ীর ময়লা অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে তজ্জন্য ড্রেনগুলিকে নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করিবে। যে ডোবা বা জলাশয়ে আবর্জ্জনাদি গিয়া পড়ে, তাহা ভরিয়া গেলে মাটী দিয়া উহা ঢাকিয়া রাখিবে এবং অন্য নূতন ডোবা প্রভৃতিতে ময়লা ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে। যে স্থানে নদীতে ঐ সকল ময়লা পড়ে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের জল যাহাতে কোন লোক ব্যবহার না করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গ্রামের শুষ্ক ময়লাও কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া পুঁতিয়া বা পুড়াইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল। তাহা যদি একান্তই কোন উপায়ে এক স্থানে লওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক বাড়ীর ময়লাই যাহাতে পুঁতিয়া বা পুড়াইয়া ফেলা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শহরের তরল ময়লা সাধারণতঃ পাকা ড্রেনের মধ্য দিয়া অপসৃত হয়। ঐ সকল ড্রেন নিয়মিত ভাবে পরিষ্কার করা দরকার। অন্যান্য ব্যবস্থা পূর্ব্বেই গ্রামের সম্বন্ধে বলিবার সময় উল্লিখিত হইয়াছে। শহরের শুষ্ক আবর্জ্জনাদি সহজেই গাড়ীতে করিয়া দূরে লইয়া পুঁতিয়া বা পুড়াইয়া ফেলা হয়। যতক্ষণ তাহা ডাষ্ট্‌বীনে (dustbin) থাকে ততক্ষণ যেন তাহার মুখ ঢাকা থাকে এবং প্রত্যেক বাড়ীর আবর্জ্জনা যাহাতে যেখানে সেখানে না ফেলিয়া নির্দ্দিষ্ট ডাষ্ট্‌বীনে আনিয়া জড় করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ময়লা সরাইয়া লওয়ার পর ঐ স্থানে চূণ, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি দেওয়া দরকার। শহরের মিউনিসি-

প্যালিটি বা কর্পোরেশন এসকল ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে। তাহা না হইলে শহরে কত প্রকার রোগের যে সৃষ্টি ও বিস্তার হইত কে বলিবে?

গ্রাম্য পায়খানা

শহর ও পল্লীগ্রামে মলত্যাগের জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা দেখা যায়। গ্রামে কোন কোন অঞ্চলে কোন রকম পায়খানাই থাকে না। আবার কোন কোন গ্রামে বা বাড়ীতে পায়খানার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। সাধারণতঃ গ্রামে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দেখা যায়।

পায়খানার অব্যবস্থা—অনেক গ্রামে বাড়ীতে কোন প্রকার পায়খানার ব্যবস্থা থাকে না। তথাকার লোকেরা মাঠে, বাগানে বা পুকুরে ও খালের ধারে যে যেখানে সুবিধা পায় সে সেখানেই মলত্যাগ করে। ইহা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। বাড়ীতে কোন প্রকার ব্যবস্থা না থাকিলে লোকে বাধ্য হইয়াই এরূপ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ইহার ফলে যে কি ভীষণ অনিষ্ট হয় তাহা কেহই ভাবিয়া দেখে না। বর্ষার সময় ঐ সকল মলমূত্র জলের সহিত পুকুর, নদী প্রভৃতিতে গিয়া পড়ে। অন্য সময়ে উহা শুকাইয়া ধূলা বালির সহিত মিশিয়া থাকে এবং উড়িয়া গিয়া অন্য স্থানে পড়ে। তাছাড়া নানা প্রকার পোকা কীট, মাছি প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল মল হইতে দূষিত জীবাণু অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। সুতরাং সকল অবস্থাতেই মলত্যাগের

এই অব্যবস্থা অনিষ্টকর। যেখানে কোন প্রকারেই পায়খানার ব্যবস্থা করা না যায়, তথায় অন্ততঃ পক্ষে ছোট গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখা বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে মলত্যাগ করিবার পরই তাহা ছাই, বালুকা, মাটী প্রভৃতি দ্বারা ভাল ভাবে ঢাকিয়া রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে উহার দ্বারা খুব বেশী অনিষ্ট হইবে না।

গর্ত্ত পায়খানা—গ্রামে সাধারণতঃ গর্ত্ত পায়খানা (Trench latrine) দেখা যায়। এই ব্যবস্থা বিনা খরচেই সম্ভবপর, তবে ইহাও নিরাপদ নহে। বাসগৃহ বা পুকুর হইতে অন্ততঃ ২০০ ৩০০ গজ দূরে একটি গর্ত্ত খুঁড়িয়া পায়খানার ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ পায়খানার নিকটেই শুকনা মাটী, বালি, ছাই প্রভৃতি রাখিবে এবং উহাতে যেন বৃষ্টির জল সোজাসুজি পড়িতে না পারে ঐ উদ্দেশ্যে উপরে ছাউনি দিবে। প্রত্যেক লোক মলত্যাগ করিয়াই সেই সঞ্চিত ছাই, বালি প্রভৃতি ফেলিয়া মল ঢাকিয়া দিবে। এভাবে কিছুকাল চলিবার পর যখন গর্ত্তটি ভরিয়া যাইবে তখন তাহা মাটি দিয়া ভাল ভাবে ঢাকিয়া দিবে। তখন উহার নিকটে আর একটি নূতন গর্ত্ত কাটিয়া ঐভাবে তথায় মলত্যাগের ব্যবস্থা করিবে। এরূপ ব্যবস্থা করিলে প্রত্যেকটি পূর্ব্ববর্ত্তী গর্ত্ত হইতে কেবল যে দুর্গন্ধ বাহির হইতে পারিবে না, তাহা নহে। পরন্তু তাহার মধ্যস্থিত মল পচিয়া মাটীর সহিত মিশিয়া কালক্রমে উৎকৃষ্ট সারের সৃষ্টি হইবে। এরূপ পায়খানা করিবার পূর্ব্বেই সাবধান

থাকিবে যেন উহার মধ্য দিয়া জল চুয়াইয়া নিকটবর্ত্তী কূয়া বা কোন পুকুর প্রভৃতিতে গিয়া পড়িতে না পারে।

যে সকল গ্রাম উঁচু বা যেখানে মাটী খুব শক্ত তথায় বেশ গভীর গর্ত্ত করিয়া তাহার মুখ বিলাতি মাটি, ইট প্রভৃতি দিয়া বাঁধিয়া দিয়া এক প্রকার পায়খানা তৈয়ার করা হয়। উহাদিগকে Pit latrine বলে।

ঐ প্রকারে আরও গভীর গর্ত্ত খুঁড়িয়াও পায়খানা তৈয়ার করা যায়। তাহাদের মুখ বাঁধাইয়া দিয়া বসিবার সুবিধা করা যায়। ইহার ফলে দুর্গন্ধও কম বাহির হয়। ঐরূপ পায়খানাকে Boredhole latrine বলে। এই দুই প্রকার পায়খানার গর্ত্ত বেশী গভীর থাকে বলিয়া মাটীর ঠিক নীচ দিয়া যে জল (subsoil water) প্রবাহিত হয় তাহার সহিত উহাদের মধ্যস্থিত মলমূত্র প্রভৃতি মিলিতে পারে না। কাজেই উহারা অধিকতর নিরাপদ এবং উহা হইতে দুর্গন্ধও কম বাহির হয়।

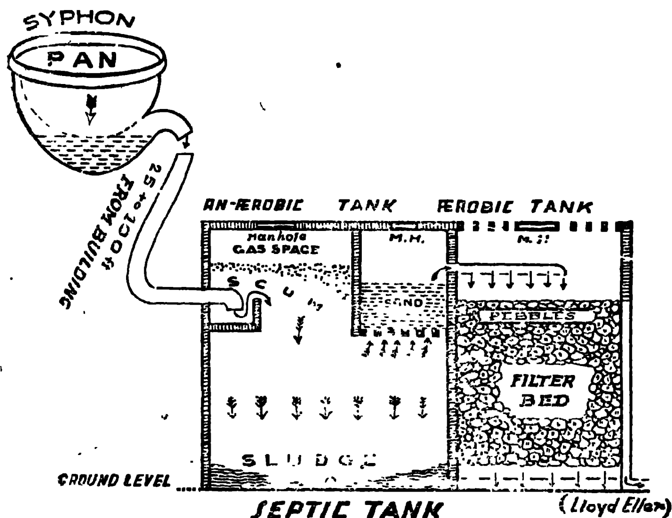
কূয়া পায়খানা—গ্রামে কোন কোন বাড়ীতে কূয়া পায়খানা দেখা যায়। ঐরূপ পায়খানার জন্য একটি গভীর কূয়া তৈয়ার করিয়া তাহার উপরে একটি পাকা পায়খানা তৈয়ার করান হয়। এই পায়খানা পূর্ব্বের অন্যান্য ব্যবস্থা অপেক্ষা অধিকতর আরামদায়ক এবং কম অপকারী। ইহাদের মধ্য হইতে ময়লা সময় সময় তুলিয়া ফেলা যায় এবং কিছু দিন পরে আবার ঐ পায়খানা ব্যবহার করা চলে। কিন্তু ইহাদের মধ্য

হইতে জল চুয়াইয়া পুকুর, পানীয় জলের কূয়া প্রভৃতিতে গিয়া মিলিতে পারে।

খাটা পায়খানা—যেখানে মেথর রাখা সম্ভবপর তথায় খাটা পায়খানার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এইরূপ পায়খানার জন্য গর্ত্ত করা হয় না, বরং পায়খানার জায়গাটি সামান্য উঁচু হইলে ভাল। বাড়ীর উত্তর পশ্চিম দিকে কোন স্থানে বাসগৃহ এবং পুকুর হইতে ১০০-১৫০ গজ দূরে এরূপ পায়খানা তৈয়ার করা উচিত। এরূপ পায়খানা পাকা ঘর, বা কাঁচা ঘর দুই প্রকারই হইতে পারে। পায়খানার নীচে দুইটি আলকাতরা মাখান বালতিবা টিন থাকিবে। একটিতে পায়খানা করিবে এবং অপরটিতে শৌচ করিবে। এই ধরণের পায়খানায় এরূপ ভাবে টিন দুইটি বসান দরকার যাহাতে একটিতে কেবলমাত্র জল, প্রস্রাব প্রভৃতি এবং অপরটিতে কেবলমাত্র মল জমা হয়। পায়খানার মল লইয়া যাইবার জন্য পায়খানার নীচে দরজা থাকিবে এবং তাহা খুলিয়া মেথর প্রত্যহ ময়লা লইয়া যাইবে ও পুনরায় বন্ধ করিয়া রাখিবে। এইরূপ পায়খানা হইতে ময়লা লইয়া কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা করিবে এবং পরে তাহা ঢাকুনিযুক্ত গাড়ীতে করিয়া লোকের বাসস্থান হইতে দূরে লইয়া পুঁতিয়া রাখিবে। পুঁতিয়া ফেলিবার জন্যও একটি বড় জায়গা দরকার এবং তথায় একটি গর্ত্ত ময়লাদ্বারা পূর্ণ হইলে, তাহা বন্ধ করিয়া অপর গর্ত্তে পুঁতিবে। এরূপ ব্যবস্থা হইলে দুর্গন্ধ বেশী বাহির হইবে না এবং প্রত্যেক গর্ত্ত হইতে পরে সার পাওয়া

যাইবে। তাছাড়া কিছুদিন পরে আবার পূর্ব্বের গর্ত্তের স্থানে ময়লা পুঁতিতে পারিবে।

সেপটিক ট্যাঙ্ক পায়খানা—যে সকল বাড়ীতে বেশী দূরে পায়খানা তৈয়ার করান সম্ভবপর নহে, অথবা মেথর পাওয়া

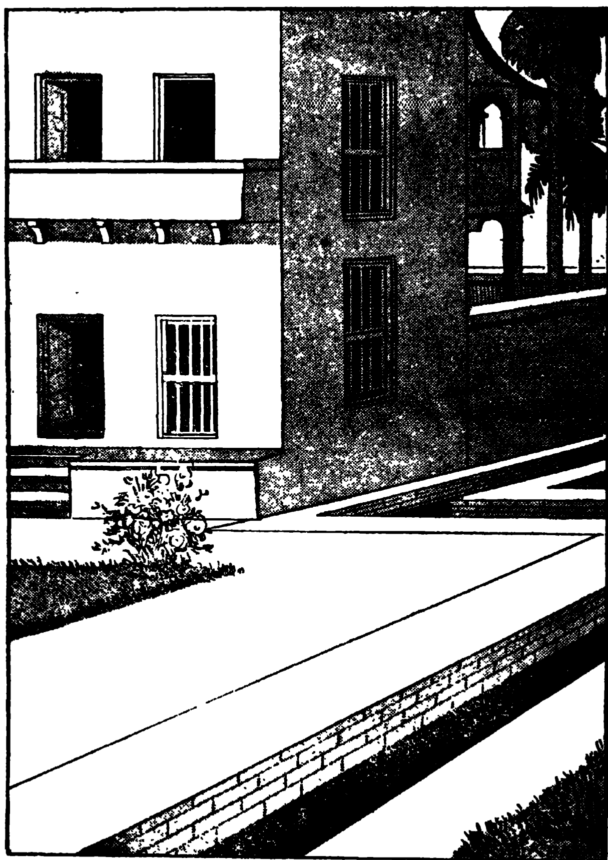


সেপটিক ট্যাঙ্ক পায়খানা

যায় না তথায় এইরূপ পায়খানা তৈয়ার করান ভাল। ইহাতে বাড়ীর স্বাস্থ্যহানি হইবার ভয় থাকে না। এরূপ পায়খানার চারিটি পৃথক্ অংশ থাকে এবং উহাদের প্রত্যেকের কাজও ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম অংশে মল, মূত্র, শৌচের জল প্রভৃতি

জমা হয় এবং ধীরে ধীরে দ্বিতীয় অংশে যায়। তথায় একটি সম্পূর্ণ আবদ্ধ, বায়ুশূন্য অথচ অর্দ্ধেক জলপূর্ণ চৌবাচ্চা থাকে। তথায় একপ্রকার অবায়বীয় জীবাণু (Anaerobic germs) দ্বারা মল ক্রমশঃ তরল হয়। এই অংশে পূর্ব্বের জল ঝামা, পাথর বা ইটের টুকরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয় এবং বায়বীয় জীবাণু (Aerobic germs) দ্বারা অনেক পরিমাণে বিশোধিত হয়। ইহার পর চতুর্থ অংশে ঐ জল আসিয়া জমা হইলে তাহাকে উত্তম সাররূপে ব্যবহার করা যায়। এই জলকে প্রবাহিত করিবার জন্য পাকা ড্রেন থাকে। এই প্রকার পায়খানা তৈয়ার করিতে একটু বেশী খরচ পড়িলেও ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল বলিয়া যত অধিক ক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার সম্ভবপর হয় ততই ভাল।

ড্রেন পায়খানা—এই প্রকার পায়খানা বড় শহর ভিন্ন অন্যত্র তৈয়ার করা সম্ভবপর হয় না। এগুলি সাধারণতঃ পাকা পায়খানা হয় এবং ইহাদের নিম্নলিখিত অংশ থাকে। প্রথমতঃ পায়খানার উপরে একটি জলের তিন গ্যালন মাপের লৌহ জলাধার বা Cistern থাকে। তাহাতে একটি শিকল ঝুলান থাকে। ঐ শিকল ধরিয়া টান দিলে লৌহ জলাধারের জল পায়খানাতে আসিয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঐ লৌহ জলাধার পুনরায় জলদ্বারা পূর্ণ হয়। দ্বিতীয়তঃ পায়খানাতে একটি প্যান (Syphon pan) থাকে। ঐ প্যানের নীচের দিকে সকল সময় কিছু জল থাকে। তাহাতে উপরের মল গিয়া জমে, কিন্তু নীচের দুর্গন্ধ ঐ জল ভেদ করিয়া উপরে আসিতে পারে না।



বাড়ী ও তাহার চারিপাশে পাকা ড্রেন পৃঃ ৬৯

সিষ্টার্ণের বা উপরের জলাধারের জল আসিয়া মলমূত্র প্রভৃতি নীচের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যায়। ঐ সকল জিনিষ সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার নীচের স্যুয়ারে (Sewer) বা ভূগর্ভনিহিত ড্রেনে পতিত হয় এবং তথা হইতে শহরের ময়লা অপসারণ ব্যবস্থা অনুসারে তাহা দূরে কোন নদী বা জলাশয়ে নীত হয়। তৃতীয়তঃ প্যানের ঠিক নীচ হইতে একটি ভেন্টিলেশন পাইপ (Ventilation pipe) সোজাভাবে রাখিতে হইবে যেন তাহার মধ্য দিয়া সকল দূষিত বাষ্প বাড়ীর উপরে উঠিয়া যাইতে পারে। এইরূপ পায়খানা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ উপকারী।

নর্দ্দমার অব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য

বাড়ীর তরল ময়লা অপসারণের নর্দ্দমা, রাস্তার ড্রেন ও শহরের স্যুয়ার প্রভৃতির সাহায্যে সকল প্রকার দূষিত তরল জিনিষ বা মলাদি বাড়ীঘর হইতে দূরে নীত হয়। সুতরাং ইহাদের সহিত স্বাস্থ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এই সকল নালা, নর্দ্দমা প্রভৃতি কাজের উপযোগী না থাকিলে বা ইহাদের মধ্য দিয়া সকল জিনিষ প্রবাহিত হইতে না পারিলে, অথবা ইহারা ভাঙ্গিয়া বা নষ্ট হইয়া গেলে লোকের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়। কখন কখন ইহারা মাঝ পথে ভাঙ্গিয়া গেলে এমন দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়ে যে লোকের পক্ষে তথায় বাস করাই কষ্টকর হয়। তাছাড়া কখন কখন ঐরূপ নালা, নর্দ্দমা প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া জল চুয়াইয়া অন্য খাল, কূয়া বা পুকুরে গিয়া পড়ে। তাহাতেও স্বাস্থ্যের ভীষণ অনিষ্ট হয়। অনেক

সময় কাঁচা ড্রেনের ধারে ইন্দুর, আরশুলা প্রভৃতি বাস করে এবং উহারা নানারূপ দূষিত জিনিষ ড্রেন হইতে লইয়া অন্যত্র ফেলে এবং তাহাতেও লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। পাকা ড্রেনও ঠিক মত মেরামত না করাইলে বা পরিষ্কার না করাইলে অনেক রোগ বিস্তৃত হয়। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া প্রত্যেক বাড়ী, পল্লীগ্রাম ও শহরের নর্দ্দমা-সমূহের সুব্যবস্থা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

বাসগৃহ ও প্রাঙ্গণ

বাসগৃহের স্থান নিরূপণ প্রসঙ্গেই এই বিষয়ের কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে প্রত্যেক বাড়ীতেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ থাকা একান্ত দরকার। বাড়ীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক বিশেষ ভাবে খোলা রাখা দরকার। তাহা হইলে বাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ পাওয়া যাইবে এবং বায়ু-প্রবাহেরও সুবিধা হইবে। তাছাড়া বাড়ীতে খোলা জায়গা বেশী থাকিলে একটু দূরে পায়খানা তৈয়ার করার সুযোগ থাকে এবং নানা প্রকার ফুল ও ফলের বাগান তৈয়ার করিয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করা যায়। ঠিক ঘরের গায়ে ঘর বা বাড়ীর পাশে বাড়ী তৈয়ার করা কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। বড় বড় শহরে লোকে স্থানাভাবে অনেক সময়ে বাড়ীর গায়ে বাড়ী তৈয়ার করিতে বাধ্য হইলেও ঐ ব্যবস্থা যে স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ভাল নহে

তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। সেজন্যই ঢাকা, কলিকাতা, দিল্লী প্রভৃতি সকল বড় শহরেই নূতন যে সকল বাড়ী তৈয়ার হয় তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রাখা হয় এবং কিছু দূরে দূরে পার্ক বা খোলা জায়গা রাখার ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন

1. What is the influence of sun-rays on health? How do we forget that influence, describe in detail. (C. U. 1942)

2. Why is water essentially required for the sustenance of life? State in terms of country measure the amount of water required per head daily in an Indian family. (C. U. 1942)

দ্বিতীয় অধ্যায়

বস্ত্র ধৌতকরণ

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরিধান করাকে কেহ কেহ বাবুগিরি বলিয়া মনে করিলেও সকল ক্ষেত্রে পরিষ্কার কাপড় পরা দূষণীয় নহে। বরং উহা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে বিশেষ অনুকূল এবং সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করে। সেজন্য সকল লোকের পক্ষেই সাধ্যমত পরিষ্কার পোষাক পরিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য (অবশ্য, এজন্য বাবুগিরির প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে)। এখানে ইহা স্পষ্টভাবে বলা প্রয়োজন যে পরিষ্কার কাপড় বলিতে কেবলমাত্র ধোপাবাড়ীর বা লণ্ড্রীর ইস্ত্রিকরা কাপড়কেই বুঝায় না। ধোপা বা লণ্ড্রীর সাহায্যে কাপড় জামা সকল সময় পরিষ্কার করাইতে যেমন অধিক পয়সা দরকার হয়, তেমনই জামাকাপড়ের অনিষ্টও হয়। কারণ তাহারা পরিষ্কার করিবার জন্য অনেক অনিষ্টকর ক্ষার ব্যবহার করে। ইহাতে শীঘ্র শীঘ্র কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। সকল প্রকার কাপড় চোপড় সকল সময়েই আবার ধোপার বাড়ীতে কাচিবার জন্য দেওয়া সম্ভবও হইয়া উঠে না। এসকল নানা অসুবিধার ফলে কিছু কিছু কাপড় জামা সকলেরই নিজ নিজ বাড়াতে কাচিয়া লওয়া দরকার হয়।

ময়লা ও দাগ পরিষ্কার

আমাদের কাপড় জামা নানা কারণে ময়লা হয় এবং ঐ ময়লাও নানাভাবে পরিষ্কার করা যায়। কেবল মাত্র বাতাসের সহিত প্রবাহিত ধূলিকণা লাগিয়া যে জামা কাপড় ময়লা হয় তাহা ঝাড়িয়া ফেলিলে বা বুরুশ করিলেই তাহা পরিষ্কার হয়। পরিষ্কার জলে তাহাকে কাচিলেও ঐ ময়লা উঠিয়া যায়। কিন্তু আমাদের শরীর হইতে যে স্বেদ-বিন্দু বা ঘাম বাহির হয় তাহার সহিত ধূলা-বালি লাগিয়া যদি জামাকাপড় ময়লা হয় তাহা হইলে উহাকে ধুইলে বা বুরুশ করিলে পরিষ্কার হয় না। তাছাড়া ঘামের দাগও ঐভাবে উঠিতে চায় না। নানা প্রকার তৈলাক্ত জিনিষ, কালি, গাছপালার পাতার রস ও অন্যান্য বহু জিনিষের দাগ লাগিয়া জামা কাপড় ময়লা হয়। ঐ সকল ময়লা পরিষ্কার করিতে হইলে কাপড় জামাকে ক্ষারজল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। কখন কখন পেট্রোলিয়াম, বেঞ্জিন, ক্লোরোফর্ম্ম প্রভৃতি নানা প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যও জামাকাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহার করিতে হয়।

ধৌত করিবার উপকরণ-সমূহ

জল – কাপড় চোপড় ধৌত করিবার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ জল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে কেবল মাত্র পরিষ্কার জলে কাচিলে কাপড়ের কিছু ময়লা দূর হয়। কাপড় কাচার জন্য নরম জল দরকার, কঠিন (খনিজদ্রব্য মিশ্রিত) জলে সাবান গুলিলে ভাল ফেনা

হয় না এবং কাপড় কাচিলে পারিষ্কারও হয় না। ঐ জলে ক্যালশিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম (লবণ) থাকিলে সাবান কাপড়ের গায়ে চট্‌চটে জিনিষের মত লাগিয়া থাকে। সেইজন্য কাপড় কাচার জন্য যাহাতে নরম জল পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। কঠিন জলকে নিম্নলিখিত উপায়ে নরম জলে পরিণত করা যায়। প্রথমতঃ তাহাকে উত্তপ্ত করিলেই নরম হয়; দ্বিতীয়তঃ ঐ জলের সহিত কাপড়-কাচা সোডা মিশাইলে নরম হয়; তৃতীয়তঃ যে জলে অধিক চূণ জাতীয় জিনিষ থাকে তাহার সহিত ক্ষার মিশাইলে নীচে তলানি পড়ে এবং উপরের জল নরম হয়। তাছাড়া, জলে কোন প্রকার ময়লা বা অন্য কোন প্রকার জিনিষ থাকিলে নির্ম্মলীফল, ফটকিরি ও সোহাগা মিশাইয়া রাখিলে জলের ময়লা নীচে পড়ে ও উপরে পরিষ্কার নরম জল পাওয়া যায়।

ক্ষার—কাপড় কাচিবার দ্বিতীয় উপকরণ ক্ষার। গ্রাম অঞ্চলে অতি সহজ উপায়ে নানা প্রকার ক্ষার তৈয়ার করিয়া তাহা দ্বারা কাপড় কাচা হয়। তবে সকল ক্ষার সমান উপকারী নহে। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিভিন্ন প্রকার ক্ষার কাপড় কাচার জন্য ব্যবহৃত হয়। যথা—সাজিমাটি ও চূণ মিশাইয়া ফুটাইয়া যে ক্ষার তৈয়ার হয় তাহাকে পটাশ বা কষ্টিক সোডা বলে। তেঁতুল বীজ বা কলাগাছ হইতেও গ্রাম অঞ্চলে ক্ষার তৈয়ার হয়। বাজারে কাপড় কাচা সোডা পাওয়া যায়। কাপড় কাচার জন্য তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়। অবশ্য, আজকাল সাবানের

প্রচলন বেশী হইয়াছে। এমন কি ধোপারাও সোডার সহিত সাবান মিশাইয়া লইয়া কাপড় কাচে। ক্ষার বা খারাপ সাবান বেশী লাগাইলে কাপড়ের অনিষ্ট হয়। তাহাতে কাপড় তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া যায় বা দাগ পড়ে। সেজন্য ভাল সাবান ব্যবহার করা উচিত এবং ক্ষার ব্যাবহার সম্পর্কেও সাবধান হওয়া উচিত। সাবানে ক্ষারের পরিমাণ বেশী আছে কি না, অথবা সাবানের সহিত বালি, মাটি প্রভৃতি মিশান আছে কি না, তাহা অতি সহজেই পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে। সাবানে ক্ষারের পরিমাণ বেশী থাকিলে ঐ সাবান-গোলা জলে লেবুর রস পড়িলেই বুদ্বুদ দেখা যাইবে; অথবা সাবানে খারাপ জিনিষ (বালি, মাটি প্রভৃতি) মিশান থাকিলে সাবান গোলা জলের নীচে ঐ সকল জিনিষ জমিয়া যাইবে।

উত্তাপ—কাপড় সিদ্ধ করিবার জন্য প্রচুর উত্তাপ প্রয়োজন। শহর অঞ্চলে কয়লার উনুনে এবং গ্রামে কাঠের উনুনে কাপড় সিদ্ধ হইয়া থাকে। কয়লা অপেক্ষা কাঠের আগুনের উত্তাপ কাপড় কাচার জন্য ব্যবহার করাই ভাল।

কড়া, গামলা প্রভৃতি—কাপড় কাচিবার জন্য বড় ধামা, সিদ্ধ করিবার জন্য টিন বা লোহার কড়া এবং সাবান জল, নীলের জল প্রভৃতি রাখিবার জন্য কয়েকটি কলাই করা বড় গামলা, টব প্রভৃতির দরকার।

'পাট' বা তক্তা—কাপড় কাচিবার জন্য কাঠের পুরু তক্তা বা 'পাট' দরকার। কখন কখন বাঁধান শানের উপরও কাপড় কাচা

হয় কিন্তু উহার ফলে কাপড় নষ্ট হয়। সেজন্য পাট ব্যবহার করা ভাল। কাঠের পাটে কাপড় আছড়াইয়া কাচা হয়।

কলপ—কাপড় যাহাতে শক্ত হয় সেজন্য কলপ বা মাড় দেওয়া হয়। চাউল, চিঁড়া প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া মাড় তৈয়ার করা হয়। কলপ দেওয়া কাপড় অনেকদিন সাফ থাকে। বায়ুর সহিত বাহিত ময়লা সহজে কলপ দেওয়া কাপড়-জামাকে ময়লা করিতে পারে না।

নীল—কাপড় কাচিবার পর উহা নীল গোলা জলে ধুইয়া লইলে কাচা কাপড় ভাল দেখায়। সেজন্য জলের মধ্যে নীল গুলিয়া লইতে হয়।

দড়ি, খোলা মাঠ প্রভৃতি—কাপড় শুকাইবার জন্য একদিকে দরকার মোটা দড়ির এবং অন্য দিকে খোলা সবুজ ঘাসযুক্ত মাঠের। সবুজ ঘাসের উপর কাপড় বিছাইয়া শুকাইলে দড়ি, খুঁটি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবার চিন্তা থাকে না এবং এই ব্যবস্থায় কাপড় বেশী পরিষ্কার হয়।

ইস্ত্রি—কাপড় ইস্ত্রি করিবার জন্য একখানা বড় কাঠের টেবিল, পিতল বা লোহার ইস্ত্রি এবং উত্তাপ দরকার। রেশমী ও পশমী কাপড়ের জন্য পিতলের ইস্ত্রি ভাল এবং উত্তাপের জন্য কাঠ কয়লাই সুবিধাজনক। তবে লোহার ইস্ত্রি গরম করিবার জন্য পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহৃত হয় এবং কলিকাতার মত শহরে বৈদ্যুতিক উত্তাপে কাপড়ের ইস্ত্রি গরম করা হয়। কাপড় ইস্ত্রি করিবার পূর্ব্বে ভাঁজ করিয়া তাহাতে একটু ঠাণ্ডা জল ছিটাইয়া দিতে হয়। কড়া বা শক্ত ইস্ত্রির জন্য এরারুট ও সোহাগা মিশ্রিত জলে কাপড় ভিজাইয়া লইতে হয়।

নানাপ্রকার বস্ত্র ধৌতকরণ

কার্পাস বস্ত্র—আমরা কার্পাস বস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করি। কাজেই এই প্রকার বস্ত্র ধৌত করিবার নিয়ম সর্ব্বপ্রথম শিক্ষা করা প্রয়োজন। এইরূপ কাপড় কার্পাস তূলা দ্বারা তৈয়ার হয় এবং গরম দেশে উহা ব্যবহার করিলে বেশী গরম বোধ হয় না। সর্ব্বপ্রথম ময়লা কাপড়গুলিকে কিছুকালের জন্য ঠাণ্ডা, নরম, পরিষ্কার জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। ঈষৎ উষ্ণ জলে ভিজাইলেও ভাল হয়, কিন্তু বেশী গরম জল কখনও ব্যবহার করা উচিত নয়। তারপর একটি এনামেল করা পাত্র বা টব ইত্যাদির মধ্যে সাবান গোলা ঈষৎ উষ্ণ জল রাখিবে। কাপড়গুলিকে পূর্ব্বের জল হইতে তুলিয়া নিংড়াইয়া ঐ সাবান গোলা জলে ফেলিবে এবং কিছুকাল তথায় নাড়িয়া চাড়িয়া যাহাতে সকল স্থানে ভাল ভাবে সাবান জল লাগে তাহার ব্যবস্থা করিবে। কাপড়গুলি কিছুক্ষণ ঐভাবে ভিজাইয়া রাখিতেও পারা যায়। তারপর কাপড়গুলিকে তুলিয়া পরিষ্কার নরম জলে কাচিয়া ফেলিবে। কাপড় থুপিয়া থুপিয়া কাচিলে বেশী পরিষ্কার হয়। এই উপায়ে একবারে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার না হইলে আবার একটু নূতন সাবান গোলা জলে কাপড়গুলিকে ফেলিয়া পরে খুব ভাল করিয়া শীতল জলে ধুইয়া ফেলিবে। তারপর কাপড়গুলি নিংড়াইয়া ঘাসের উপর বা দড়ির উপর ফেলিয়া শুকাইয়া লইবে। কাপড় শুকাইবার পূর্ব্বে উহা নীলের

জলে একবার ডুবাইয়া লওয়া দরকার। তারপর কাপড় ভাল ভাবে শুকাইয়া মাড় বা কলপ দিয়া ইস্ত্রি করিবে।

ধোপাদের কাপড় কাচিবার প্রণালী পৃথক্। তাহারা প্রথমে প্রত্যেক পরিবার বা ব্যক্তির জন্য আলাদা দাগ দেয়। তারপর বিভিন্ন প্রকার কাপড় (যথা—বেশী ময়লা, তেলচিটা, কম ময়লা প্রভৃতি) বাছিয়া লয়। তারপর তাহারা কাপড়ে সাবান, সাজিমাটি, সোডা প্রভৃতি গোলা জলের ছিটা দেয়। তারপর কাপড়গুলিকে একটু কাচিয়া একটি বড় পাত্রে সাবান, সোডা, সাজিমাটী গোলা জল রাখিয়া তাহাতে কাপড়গুলি সাজাইয়া দেয়। সকলের নীচে সবচেয়ে ময়লা ও তেলচিটা কাপড়, তাহার উপর কম ময়লা কাপড় এভাবে পর পর সাজাইয়া রাখে। তাহার উপর একটি ছিদ্রযুক্ত ঢাকনা দিয়া কাপড়গুলিকে রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টা মৃদু উত্তাপে সিদ্ধ করে। ইহাকে ভাঁটি দেওয়া বলে। তারপর কাপড়গুলিকে লইয়া শীতল জলে কাচে। অতঃপর ধোপারা কাপড়ে নীলের ছিটা দেয়, শুকায় ও সকলের শেষে ইস্ত্রি করে। নূতন কাপড়, তেলচিটা কাপড় ও অতিশয় ময়লা কাপড়ে দুইবার ভাঁটি দিতে হয়। এইরূপভাবে কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য উহাদিগকে সিদ্ধ করিবার সময় কিছু কেরোসিন, প্যারাফিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয়। উহার ফলে কাপড় খুব পরিষ্কার হয়।

কাপড়ে কোন রকম **দাগ** লাগিলে তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে তুলিয়া ফেলা হয়। চা, কাফি প্রভৃতির দাগ লাগিবার সঙ্গে সঙ্গে শীতল জলে ধুইয়া গ্লিসারিন মিশান জল ও সাবান জলে

ধুইবে। দাগ শুকাইয়া গেলে মিথিলেটেড স্পিরিট্, সোহাগার জল দ্বারা ধুইবে। কালীর দাগ হাইড্রোজেন প্যারঅক্সাইড দিলেই উঠিবে। সাইট্রিক অ্যাসিড্ বা লেবুর রস দিলেও কাপড় হইতে কালির দাগ উঠিয়া যায়। লতা পাতা বা ফলের কস বা রস লাগিলে লবণ জলে ধুইবে। দাগ শুকাইয়া গেলে লেবুব রস, সাইট্রিক এসিড্ প্রভৃতি দ্বারা ধুইবে। লোহার মরিচার দাগ লাগিলে অক্স্যালিক এসিড্ দিলে উঠিবে এবং রক্তের দাগ হাইড্রোজেন প্যারঅক্সাইড ও গ্লিসারিণ জলে ধুইলে উঠিয়া যাইবে। কাপড়ে টিংচার আইওডিন পড়িয়া গেলে দুধ দিয়া ঘষিলে সেই দাগ খানিকক্ষণ পরেই অস্পষ্ট হইতে হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া যাইবে।

রঙ্গীন বস্ত্র পরিষ্কার করিবার জন্য একটু বেশী সাবধান হওয়া দরকার। সাদা কাপড়ের সঙ্গে রঙ্গীন কাপড় সিদ্ধ করিলে ঐ কাপড়ের রঙ্ লাগিয়া সকল কাপড়ই নষ্ট হইতে পারে। সেজন্য রঙ্গীন কাপড় পৃথকভাবে কাচিতে হয়। উহাদিগকে প্রথমে পৃথক করিয়া লইতে হয়। তারপর সাবান গোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া উহাদিগকে পরিষ্কার জলে কাচিয়া লইবে। অধিক উত্তপ্ত জলে রাখিলে বা সিদ্ধ করিলে এই সকল কাপড়ের রঙ্ উঠিবার আশঙ্কা থাকে।

পশমী ও রেশমী বস্ত্র—মেষের লোম হইতে পশমী বস্ত্র তৈয়ার করা হয় এবং গুটি পোকা হইতে রেশমী বস্ত্র তৈয়ার হয়। এরূপ পোকা নানা প্রকার এবং উহারা তুঁত, কুল প্রভৃতি

নানা প্রকার গাছের পাতা খায়। পোকা ও তাহাদের খাদ্যের পার্থক্যের জন্য সূতারও পার্থক্য হয়। মুগা, রেশম, এণ্ডি প্রভৃতি বহু প্রকারের রেশমী বস্ত্র আছে। এই সকল কাপড় খুব নরম। ইহাদিগকে কখনই অধিক গরম জলে সিদ্ধ করিবে না। উহাদিগকে সাবান গোলা সামান্য উত্তপ্ত জলে ডুবাইয়া রাখিবে, পরে কাচিয়া লইবে। খুব দামী কাপড় কাচিলে নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য সেগুলিকে বার বার শীতল পরিষ্কার নরম জলে ধুইয়া ফেলিবে, তাহাতেই ময়লা দূর হইবে। যদি খুব বেশী পরিষ্কার করিতে হয় তাহা হইলে একাধিক বার সাবান গোলা জলে ভিজাইয়া পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে শীতল জলে ধুইয়া লওয়া যায়। রেশমী কাপড়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কাপড় ধোয়া হইলে গোঁড়ালেবুর রস অথবা সালফিউরিক এসিড্ মিশ্রিত জলে ভিজাইতে হয় এবং পশমী বস্ত্রের জন্য জলে ভিনিগার মিশাইতে হয়। রেশমী ও পশমী কাপড় সর্ব্বদা ছায়াতে শুকাইতে হইবে; কারণ অধিক রৌদ্রে উহাদের রঙ্ নষ্ট হইয়া থাকে। রেশমী ও পশমী কাপড় পরিষ্কার করিবার জন্য লাক্স বা সানলাইট সাবান ব্যবহার করা হয়। কখন কখন রিঠাও ব্যবহৃত হয়। এসকল জিনিষের যাহাই ব্যবহৃত হউক না কেন, উহাদিগকে জলে গুলিয়া ভাল ফেনা বাহির হইলে তাহাতে কাপড় ভিজাইতে হয়।

শুষ্ক অবস্থায় পরিষ্কার—আজকাল Dry cleaning বা শুষ্ক অবস্থায় বস্ত্র পরিষ্কার করিবার কথা খুব শুনা যায়।

এভাবে পরিষ্কার করিবার জন্য কাপড় চোপড় জলে ভিজাইতে হয় না। তাহার ফলে কাপড় কুঁচকাইয়া যাইবার কোন ভয় থাকে না। তাছাড়া এভাবে কাপড় কাচিতে ক্ষার, সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করিতে হয় না বলিয়া কাপড় নষ্টও হয় না। ড্রাই ওয়াশে কাপড় পেট্রোল, স্পিরিট, ইথার, বেঞ্জিন প্রভৃতি মূল্যবান ও অতিশয় দাহ্য পদার্থ দ্বারা পরিষ্কার করা হয়। এই সকল জিনিষ দ্বারা কাপড় যেমন খুব তাড়াতাড়ি অথচ সুন্দররূপে পরিষ্কার করা যায়, তেমনই উহাদের ব্যবহারে বিপদও আছে। ঐ সকল জিনিষ ঠিকমত ব্যবহার করিতে না পারিলে শুষ্ক অথবা ধৌত করিবার সময় কাপড় নষ্ট হওয়ার যথেষ্ট ভয় থাকে।

1. State what silk is. How is it manufactured? Name the different varieties of silk. Describe the precautions that you would observe in washing coloured silk materials at home. (C.U.—1942)

তৃতীয় অধ্যায়

রন্ধন

প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু কাজ করে এবং সে কাজ কঠিন বা লঘু যাহাই হউক না কেন, তাহার ফলে মানুষের দেহের ক্ষয় হয়। তাছাড়া নানাপ্রকার রোগের জীবাণু সর্ব্বদাই নানা উপায়ে আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছে। সেই সকল রোগ জীবাণুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন। ইহা ভিন্ন আমাদের কাজ করিবার জন্য সর্ব্বদাই শক্তি ও স্ফূর্ত্তি চাই। দেহ রক্ষার জন্য দেহের উত্তাপ রক্ষা করাও একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আমাদের পক্ষে দেহের ক্ষয় নিবারণ, উত্তাপ কর্ম্মশক্তি রক্ষা করা এবং রোগের জীবাণুকে বাধা দান একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল কার্য্য করিবার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব হইলে আমাদের রোগ হইবে, কর্ম্ম শক্তির অভাব ঘটিবে।

আমরা অধিকাংশ খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া খাই। সুতরাং রন্ধনের উপর খাদ্যদ্রব্যসমূহের স্বাদ, উপকারিতা প্রভৃতি গুণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের উপাদান ও কার্য্য

আমরা অধিকাংশ খাদ্য রন্ধন করিয়া খাই, আবার ফলমূল প্রভৃতি কিছু কিছু খাদ্য কাঁচা খাই। এস্কিমোগণ প্রায় সকল খাদ্য কাঁচা খায়। পশুপক্ষীগণ সকল খাদ্যই কাঁচা খায়। এভাবে কাঁচা বা রান্না করা যে প্রকার খাদ্যই আমরা খাই না কেন, সকল খাদ্যকেই গুণ অনুসারে নিম্নলিখিত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—(ক) **দেহ পরিপোষক** (Nutritive principles)। এই প্রকার খাদ্য দ্বারা দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি, কর্ম্মশক্তি, উত্তাপ প্রভৃতির বৃদ্ধি বা সংরক্ষণ হয়। প্রোটিন, স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য এই বিভাগের অন্তর্গত।

(খ) **দেহ সংরক্ষক** (Protective principles)। এই প্রকার খাদ্য দ্বারা দেহের জীবনীশক্তি রক্ষিত হয় বা বৃদ্ধি পায়। জল, ভাইটামিন ও লবণ জাতীয় খাদ্য এই বিভাগের অন্তর্গত।

খাদ্যদ্রব্যসমূহকে এই দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইলেও উহাদের প্রত্যেক ভাগকে আবার নিম্নলিখিত তিনটি করিয়া মোট ছয় ভাগে বিভক্ত করা হয়। কোন দ্রব্যকে উহাদের কোন একটি ভাগের অন্তর্ভুক্ত করিবার সময় তাহার প্রধান গুণ বিবেচনা করা হয়। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেই আরও বহু গুণ বর্ত্তমান থাকে।

খাদ্য নির্ব্বাচন একটি কঠিন কাজ। মানুষের দেহের পুষ্টি, কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি, রোগনিবারণ করিবার ক্ষমতা প্রভৃতি প্রত্যেক

বিষয় বিবেচনা করিয়া খাদ্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। সেজন্যই প্রত্যেক লোকের পক্ষে নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত—সকলের পক্ষে এক প্রকার খাদ্য সমান উপকারী হইতে পারে না। অবশ্য একথা সত্য যে সকলের পক্ষেই দেহ সংরক্ষক ও পরিপোষক উভয় প্রকার খাদ্য প্রয়োজন। কিন্তু এই উভয় প্রকার খাদ্যের মধ্যে আবার কাহারও পক্ষে প্রোটিন বেশী দরকার, কাহারও পক্ষে জল বেশী দরকার, কাহারও পক্ষে ভাইটামিন বেশী দরকার। এমন কি একই লোকের পক্ষে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দরকার। সেই সকল প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়াই খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

দুগ্ধ ও অন্যান্য খাদ্য

সকল প্রকার খাদ্র্য-দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সকলের পক্ষেই শিশু অবস্থায় দুগ্ধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। বাল্যকাল হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত যে কোন অবস্থায়ই ইহা আমাদের পক্ষে একটি প্রধান খাদ্য ও পানীয়, কারণ অন্য কোন প্রকার খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে দুধের মত এত অধিক খাদ্য-গুণ থাকে না। প্রত্যেক শিশুর পক্ষে তাহার মায়ের স্তন্য দুগ্ধের মত পুষ্টিকর ও উপকারী আর কোন খাদ্যই নাই। ইহা একটি আদর্শ খাদ্য এবং এজন্যই স্তন্য দুগ্ধকে অমৃত বলা হয়। যে শিশু স্বাস্থ্যবতী মায়ের স্তন্য দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে পান করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করে

তাহার স্বাস্থ্য ভাল হইবেই। পূর্ব্বে শিশুগণ এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মাতৃস্তন্য ছাড়া আর কিছুই খাইত না। আজকাল কোন কোন ক্ষেত্রে মাতৃস্তন্য হইতে শিশুকে জোর করিয়া বঞ্চিত করা হয়। ঐ সকল শিশুকে অন্য প্রকার দুধ বা খাদ্য দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহার ফলে তাহাদের স্বাস্থ্য পূর্ব্বের মত ভাল থাকে কিনা সন্দেহ।

আমরা সাধারণতঃ গরুর দুধই পান করিয়া থাকি। মহিষ, ছাগল, উট, গাধা প্রভৃতি পশুর দুধও মানুষ পান করিয়া থাকে। ঐ সকল বিভিন্ন পশু হইতে যে দুধ পাওয়া যায় তাহাদের উপাদান এবং উপকারিতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে সর্দ্দি, কাসি, আমাশয় প্রভৃতি রোগে ছাগদুগ্ধ উপকারী, কিন্তু ঐ সকল রোগে গরু বা মহিষের দুধ উপকারী নহে। বরং মহিষের দুধ পেটের রোগে অনিষ্টকর। কারণ ইহাতে চর্ব্বির ভাগ (fat) বেশী থাকায় ইহা হজম করা দুরূহ।

সাধারণতঃ দুধে নিম্নলিখিত গুণ বর্ত্তমান থাকে। (ক) ছানা—দুধের প্রোটিন অংশকে ছানা বলে। ছানা অংশের মত উৎকৃষ্ট প্রোটিন অন্য কোন খাদ্যে পাওয়া যায় না। (খ) মাখন বা ননী—দুধের চর্ব্বি জাতীয় অংশকে মাখন বা ননী বলে। (গ) শর্করা—দুধের শ্বেতসার জাতীয় অংশকে শর্করা বলে। (ঘ) লবণ—দুধের মধ্যে ক্যালশিয়াম প্রভৃতি লবণ জাতীয় জিনিষও থাকে। (ঙ) জল—দুধের মধ্যে শতকরা ৮৫ ভাগ হইতে

৯০ ভাগের মধ্যে জলীয় অংশ থাকে। (চ) ভাইটামিন—দুধের মধ্যে A, B, C, D প্রভৃতি সকল ভাইটামিনই সহজ পাচ্য অবস্থায় থাকে।

বিভিন্ন প্রকার পশুর দুধ ও মাতৃস্তন্যের মধ্যে উপাদান সম্পর্কে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় (কোন্ প্রকার দুধে কোন্ উপাদান শতকরা কত অংশ আছে তাহা দেখান হইল)।

এই হিসাবে দশমিক বাদ দেওয়া হইয়াছে।

	মাতৃস্তন্য	গোদুগ্ধ	মহিষদুগ্ধ	ছাগদুগ্ধ	গর্দ্দভদুগ্ধ
জলীয় অংশ	৮৮	৮৭	৮১	৮৬	৯০
ছানা	৩	৪	৬	৪	২
মাখন	৩	৪	৯	৫	২
শর্করা	৬	৫	৪	৫	৬
লবণ	·৫ এর কম	·৫এরবেশী	.৫এরবেশী	·৫এরবেশী	·৫এরবেশী

দুধের মধ্যে উপরিলিখিত বিভিন্ন প্রকার উপাদান থাকার ফলে উহা মানুষের শরীর গঠন, পুষ্টি বিধান, উত্তাপ সংরক্ষণ, কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি, মেধা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে অশেষ উপকারী। শিশুর পক্ষে ইহার মত সহজ পাচ্য অথচ উপকারী খাদ্য আর নাই। সেজন্যই দেখা যায় যে মাতৃস্তন্য না পাইলেও অনেক

শিশু উপযুক্ত পরিমাণ খাঁটি দুধ (গরু, ছাগ প্রভৃতির) পান করিয়া সুস্থ ও সবল থাকে। শিশুর কর্ম্মশক্তি কম নহে। সে অনবরত চঞ্চল ভাবে হাত পা নাড়ে বা ছুটাছুটি করে। তারপর তাহার দাঁত, অস্থি প্রভৃতি সঙ্গঠনের জন্য প্রচুর লবণ দরকার হয়। তাছাড়া ভাইটামিনের তো কথাই নাই। অন্য কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য হইতে এই সকল কার্য্যের উপযোগী শক্তি পাইতে হইলে শিশুকে যে পরিমাণ খাদ্য খাওয়ান দরকার তাহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না। শিশুর কথা বাদ দিলে বাল্যকাল ও কৈশোরে ছুটাছুটি, লেখা পড়ার জন্য মেধা, যৌবনে কর্ম্মশক্তি, পৌঢ় অবস্থায় নানাপ্রকার চিন্তা, বার্দ্ধক্যে দেহের ক্ষয়নিবারণ প্রভৃতি সকল অবস্থায়ই দুগ্ধ মানুষের একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও পানীয়। দুধের মধ্যে এক-বলকা দুধ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু সকল লোকের পক্ষে উহা সমান উপকারী নহে। তাছাড়া একবার দুধ গরম করিয়া রাখিয়া দিলে তাহা একটু পরেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। ঐ ঠাণ্ডা দুধ পরে খাওয়া ভাল নহে। অনেক সময় ঠাণ্ডা দুধ খাইলে নানাপ্রকার রোগও হইতে দেখা যায়, কারণ দুধের সহিত নানাপ্রকার রোগের জীবাণু সহজেই মিশিয়া যাইতে পারে। সেজন্য দুধ গরম করিয়া খাইতে হয়। কিন্তু দুধ খুব বেশী জ্বাল দিলে উহার কতক উপাদান ও ভাইটামিন নষ্ট হয়। সেজন্য পাস্তুরাইজ করা দুধ খুব ভাল। উহাতে কোন প্রকার দোষ থাকিতে পারে না। দুধ খাওয়া বিষয়ে আরও কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রথমতঃ গরুটি যাহাতে সুস্থ ও সবল হয়, যাহাতে সে মাঠে চরিয়া কাঁচা ঘাস খাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ঐরূপ গরুর দুধ সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। গরুর ঘর পরিষ্কার রাখা, উহাকে নিয়মিত ভাবে স্নান করান, দোহনের পূর্ব্বে দোহনকারীর শরীর, গরুর স্তন পরিষ্কার করা, পাত্রটি ধুইয়া লওয়া প্রভৃতি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গরু যাহাতে দোহনের সময় মলমূত্র ত্যাগ না করে, এবং পরেও যাহাতে দুধে কোন প্রকার ময়লা বা দূষিত জিনিষ না পড়ে বা মিশ্রিত হয় এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। গরুর কোন রোগ হইলে উহার দুধের মধ্যে সেই রোগের জীবাণু থাকে। ঐরূপ দুধ অনিষ্টকর। তারপর মাখন তোলা দুধ, বাসি দুধ, ক্ষীর বা অতিরিক্ত ঘন দুধ প্রভৃতি অনিষ্টকর (অবশ্য কোন কোন রোগীর পক্ষে মাখন তোলা দুধ, উপকারী)। দুধ যে পাত্রে গরম করিবে বা যে পাত্রে করিয়া পান করিবে তাহা যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। গাভী যখন প্রসব করে তখন প্রথম কয়েক দিন পর্য্যন্ত দুধ ভাল থাকে না, প্রসবের ঠিক পূর্ব্বেও কিছু দিন দুধ ভাল থাকে না। সুতরাং ঐরূপ অবস্থার গাভীর দুধ পান করা উচিত নহে। গাভীকে সাধারণতঃ প্রসবের ১ মাস (অন্ততঃ ৩ সপ্তাহ) পর হইতে দোহন করা উচিত, কিন্তু গোয়ালারা বিক্রয়ের জন্য ঐ সকল কোন নিয়মই পালন করিতে চাহে না। তাছাড়া কখন কখন তাহারা অনিচ্ছাক্রমে বা অজ্ঞাতসারে দুধে খেজুর পাতা, খড় প্রভৃতি জিনিষ বা অপরিষ্কার ঢাকনি দিয়া ঢাকিয়া দুধ দূষিত

করিয়া ফেলে। কেহ বা ইচ্ছা করিয়াই নানা স্থানের জল প্রভৃতি মিশাইয়া ও হাত ডুবাইয়া দুধকে দূষিত করিয়া ফেলে।

দুধ পুষ্টিকর খাদ্য, আবার **দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন খাদ্যসমূহও** পুষ্টিকর। দুধ হইতে বহু প্রকার মিষ্টান্ন ও নানা রকম পরিবর্ত্তিত দুধ তৈয়ার করা হয়। দধি—ইহার মধ্যে দুধের সকল উপাদান থাকে। ইহা উপকারী কিন্তু বেশী পরিমাণ খাইলে অনিষ্টকর। ঘোল—ইহাতে মাখন ও ভাইটামিন থাকে না, কারণ মাঠা না তুলিলে ঘোল হয় না। পেটের পীড়াতে ঘোল উপকারী, কারণ ইহা সহজে হজম হয়। ইহা শিশুর পক্ষে উপকারী নহে। ছানা—ইহাতে দুধের প্রোটিন অংশ ছাড়া অন্য জিনিষ প্রায় থাকে না। ইহা পুষ্টিকর খাদ্য। ছানার জল খুব উপকারী। পেটের পীড়াতে অনেক সময় ছানার জল পথ্য দেওয়া হয়। মাখন ও ননী—দধি হইতে ননী উঠান হয় এবং কাঁচা দুধ হইতে মাখন উঠান হয়। এগুলি স্নিগ্ধ ও উপকারী। ঘৃত—মাখন গলাইয়া ঘৃত তৈয়ার হয়। ইহা খুব পুষ্টিকর খাদ্য। ক্ষীর—ইহাতে দুধের ভাইটামিন থাকে না, কারণ দুধ অনেকক্ষণ জ্বাল দিয়া ঘন করিবার ফলে উহার ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। ইহা গুরুপাক হইলেও অল্প মাত্রায় উপকারী। ভাইটামিন যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে সেভাবে দুধ ঘন করিয়া যে Condensed milk বা Dry milk তৈয়ার করা হয় তাহা উপকারী।

দুধকে বাদ দিয়া **অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যসমূহকে** তাহাদের উপাদান-সমূহের প্রাচুর্য্য অনুসারে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। সুতরাং

ঐ সকল বিভাগ অনুসারেই তাহাদের আলোচনা করা উচিত। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে প্রোটিন, স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে দেহ পরিপোষক এবং লবণ, ভাইটামিন ও জল জাতীয় খাদ্যকে দেহ সংরক্ষক বলা হয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের বিভিন্ন গুণের জন্যই উহাদিগকে এভাবে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

প্রোটিন (ছানা) জাতীয় খাদ্য

প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে প্রচুর নাইট্রোজেন থাকে বলিয়া ইহাকে নাইট্রোজেন-বহুল খাদ্য (Nitrogenous food) বলে। এই প্রকার খাদ্যে দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন হয়। খাদ্যের মধ্যে প্রোটিন সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করে, কারণ কেবল মাত্র এইরূপ খাদ্য গ্রহণ করিয়াও মানুষ অনেকদিন বাঁচিতে পারে। তাছাড়া এইরূপ খাদ্যই শরীরের ক্ষয় নিবারণ এবং পুষ্টি বিধান করে। প্রোটিন পরিপাক হইয়া অ্যানিমো অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিডটি শরীর গঠন বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। যে সকল খাদ্যদ্রব্যে এই অ্যাসিড অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে উত্তম বা উচ্চাঙ্গের (Superior), সম্পূর্ণ (Complete) বা সমতারক্ষক (Balanced) প্রোটিন বলে। আর যাহাদের মধ্যে উহা কম থাকে তাহাদিগকে নিকৃষ্ট বা অধম (Inferior) প্রোটিন বলে। যে সময়ে মানুষের শরীরের বৃদ্ধি হয় (অর্থাৎ সাধারণ হিসাবে ২৫-৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত)

প্রোটিন খাদ্য অধিক (শতকরা ৪০ ভাগ) প্রয়োজনীয়। এই বয়সে খাদ্যে প্রোটিনের অংশ কম হইলে শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং পরে চেষ্টা করিলেও শরীরের উপযুক্তরূপ পুষ্টি হইবে না। সাধারণ হিসাবে খাদ্যের মধ্যে শতকরা ৪০ ভাগ প্রাণীজ বা জৈব প্রোটিন এবং ৬০ ভাগ উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হইলে খাদ্য সুসম বা উত্তম সমতারক্ষক (Well balanced diet) হয়। প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের সমতা রক্ষা হইলে শরীরের কেবল যে ক্ষয় নিবারণ হইয়া পুষ্টিবিধান হয় তাহা নহে। ঐরূপ খাদ্য গ্রহণের ফলে শরীরে কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি পায়, উত্তাপ সংরক্ষিত হয় এবং কর্ম্মে স্ফূর্ত্তি পাওয়া যায়। খাদ্যের সমতা রক্ষা করিবার জন্য আমাদের প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে ৯০ হইতে ১২০ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। অন্ততঃ ২৫—৩০ বৎসর পর্য্যন্ত এই নিয়ম পালন করিতেই হইবে। ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্তও প্রোটিন খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে হইবে। তারপর এই উপাদানের পরিমাণ কমাইতে পারা যায়।

নিম্নলিখিত খাদ্য দ্রব্যসমূহে **প্রচুর পরিমাণে** (Superior) **প্রোটিন** আছে। (দুধের) ছানা, মাংস, মাছ, ডিমের সাদা অংশ (ইহারা জৈব) এবং আটার শিরীষ (gluten), ডাল ও কড়াই শুঁটির বীজকোষ (legumin), বাদাম, পেস্তা, লাল আলু নানা প্রকার ফল ইত্যাদি (ইহারা উদ্ভিজ্জ)।

ছানা—ইহা দুধ হইতে উৎপন্ন হয়। (ইহার বিষয়ে পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে)।

মাংস—মাংসের পেশীতে প্রোটিন অংশ অধিক থাকে। পেশী-সংযোজক তন্তু গুলিতেও নিকৃষ্ট প্রোটিন থাকে। পশুদের মধ্যে ছাগ মাংসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (শতকরা ২৪ ভাগ), [গোমাংস (২০ ভাগ), মেষ মাংস (১৮ ভাগ) ও শূকর মাংস (১৫ ভাগ)] এবং পক্ষীর মধ্যে তিত্তিরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (২৫ ভাগ) প্রোটিন থাকে [মুরগী (২৩ ভাগ), পায়রা (২২ ভাগ), হাঁস (১৬ ভাগ)]।

মাছ—মাংসের তুলনায় মাছে পেশী বা প্রোটিনের পরিমাণ কম। মাছে স্নেহ জাতীয় উপাদানও কম। সেজন্য মাছ সহজে হজম হয়। বিভিন্ন প্রকার মাছের প্রোটিন অংশের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। সিঙ্গি মাছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (শতকরা ২৫ ভাগ) প্রোটিন থাকে। [কৈ মাছ (২৪ ভাগ), ইলিশ (২০ ভাগ), মাগুর (২০), মৃগেল (১৮), রুই (১৭) ইত্যাদি]

ডিম—ডিমের শাদা অংশ (Albumen বা white) উত্তম প্রোটিন। উহা সহজে হজমও হয়। হাঁস ও মুরগীর ডিমে প্রায় সমান প্রোটিন থাকে। ডিম নষ্ট হইয়া গেলে উহার ভিতরের শাদা ও হলদে অংশ মিশিয়া যায়, কিন্তু ভাল থাকিলে উভয় অংশ আলাদা থাকে।

ডাল—ডালে প্রায় মাংসের মতই প্রোটিন থাকে, কিন্তু উহা সহজে হজম হয় না। সেজন্য কেবল মাত্র ডাল খাইয়া প্রোটিনের অংশ পূরণ করা সম্ভবপর নহে। বিভিন্ন প্রকার ডালে বিভিন্ন পরিমাণ



) প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ; (মধ্যে) স্নেহ জাতীয় খাদ্য ;
(নিম্নে) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য

প্রোটিন থাকে। খেসারী ডালে উহার পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক (শতকরা ৩২ ভাগ) থাকে। [মসুর (২৫ ভাগ), সোনামুগ ও বরবটি (২৩), কাঁচামুগ ও কলাই (২২), অরহর ও ছোলা (২১)]

স্নেহ জাতীয় খাদ্য

এই প্রকার খাদ্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ বা চর্ব্বি জাতীয় উপাদান থাকে বলিয়া ইহাদিগকে Fats বলে। এইরূপ খাদ্য আহার করিলে শরীরের উত্তাপ ও কর্ম্মশক্তি বাড়ে। ইহা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের ক্ষয় নিবারণ করে এবং যেখানে প্রোটিনের সহিত অধিক স্নেহ জাতীয় খাদ্য খাওয়া যায় সেখানে আর পৃথক্‌ভাবে অধিক স্নেহদ্রব্য খাওয়ার দরকার হয় না। এইরূপ খাদ্যের মধ্যে A ও D ভাইটামিন থাকে। এইরূপ খাদ্য অধিক খাইলে শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয় এবং তখন লোক কিছু দিন উপবাস করিলেও বেশী কষ্ট হয় না। তবে মেদ বৃদ্ধি বেশী হইলে শ্বাসরোগ হয়, আবার স্নেহ পদার্থের অভাব হইলে শ্বাসরোগ, ক্ষয়রোগ, রাত্র্যন্ধতা প্রভৃতি হয়। স্নেহ পদার্থ দ্বারা শরীরের শিরা উপশিরাগুলির পুষ্টি হয়। সুতরাং শিশুদের, ছাত্রদের এবং অন্য যাহারা অধিক মানসিক পরিশ্রম করে তাহাদের পক্ষে এইরূপ খাদ্য বিশেষ দরকারী। সকল প্রকার খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে স্নেহ পদার্থই দেরীতে হজম হয়; উহা আবার শীতল অবস্থা অপেক্ষা গরম অবস্থায়

বেশী দেরীতে হজম্ হয়। প্রোটিনের সহিত স্নেহ পদার্থ মিশ্রিত হইলে সহজে হজম হয়। সেজন্য ডালে (প্রোটিন) ঘি খাওয়া উচিত। আবার ভাতের (শ্বেতসার জাতীয়) সহিত ঘি খাইলেও প্রচুর ক্লোমরস নির্গত হয় এবং হজমের পক্ষে সুবিধা হয়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী হইতে স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়। আমাদের পক্ষে শতকরা ৬০ ভাগ উদ্ভিজ্জ ও ৪০ ভাগ প্রাণীজ বা জৈব স্নেহপদার্থ খাওয়া উচিত। ঘি, মাখন, ননী, চর্ব্বি, মাছের তৈল (প্রাণীজ) এবং নানা প্রকার তৈলে (উদ্ভিজ্জ) প্রচুর পরিমাণে স্নেহ পদার্থ থাকে।

ঘি—কাঁচা পাকের হইলে ভাইটামিনযুক্ত থাকে, কড়াপাকের হইলে ঘিয়ের মধ্যে ভাইটামিন থাকে না। অথচ কড়াপাকের ঘির সুভ্রাণ থাকে বলিয়া আমরা সাধারণতঃ ঐরূপ ঘি খাই।

মাখন—ইহাতে প্রচুর ভাইটামিন থাকে।

কড্‌মাছের ও অন্যান্য মাছের তৈলে প্রচুর ভাইটামিন থাকে।

বিভিন্ন প্রকার স্নেহজাতীয় উপাদানের মধ্যে স্নেহপদার্থ ও ভাইটামিনের অস্তিত্ব

	স্নেহপদার্থ (গ্রাম)	A ভাইটামিন	D ভাইটামিন
জৈব			
ঘি	২৮		
মাছের তৈল	২৮	+++	+++
চর্ব্বি	২৬	++ (শূকর চর্ব্বি বাদ)	
উদ্ভিজ্জ			
নানা প্রকার তৈল	২৮	(কেবলমাত্র নারিকেল তৈল, অন্য তৈলে নাই)	

শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য

এই উপাদানটি বায়ুস্থিত কার্ব্বনিক এসিড্ বা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ ও জলীয় অংশ দ্বারা গঠিত হয় ; সেজন্য ইহাকে Carbo-hydrate বলে। ইহা সকল প্রকার উদ্ভিজ্জে বর্ত্তমান। তবে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জে ইহা বিভিন্ন আকারে থাকে ;

শটির পালো, চাউলের শাদা অংশ প্রভৃতিতে ইহা খাঁটি শ্বেতসার বা Pure starch হিসাবে থাকে। ঐ সকল উদ্ভিজ্জ পদার্থের প্রত্যেক তন্তুকোষের মধ্যে দানার আকারে ইহা থাকে এবং উত্তাপের দ্বারা বাহিরের খোসাটি ফাটাইলে ঐ শ্বেতসার বাহির হয়। সেজন্য ঐ প্রকার খাদ্য সুসিদ্ধ করিয়া খাওয়া উচিত। গম ও যবের ভুসি, তরকারীর খোসা প্রভৃতি খাঁটি শ্বেতসারের মত প্রত্যক্ষ উপকারী না হইলেও উহা খাদ্য পরিপাক করিতে এবং অধিক পরিমাণে খাইলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিতে সাহায্য করে। ইহাদিগকে Cellulose বলা হয় এবং এসকল জিনিষও দেহরক্ষণ এবং দেহপুষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে খুব উপকারী। তৃতীয়তঃ আখ, বীট, আঙ্গুর প্রভৃতি ও তালগাছ, খেজুরগাছ প্রভৃতি হইতে যে রস পাওয়া যায়, তাহা বিভিন্ন প্রকার চিনি (Sugar) উৎপাদন করিতে সাহায্য করে বলিয়া সেগুলিও শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বিভিন্ন প্রকার শ্বেতসারের প্রধান কাজ শরীরের উত্তাপ ও কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করা। সেই হিসাবে ইহারা স্নেহজাতীয় উপাদানের প্রায় একরূপ হইলেও দুই ভাগ শ্বেতসারে যে কাজ হয় একভাগ স্নেহ পদার্থে তাহা হয়। কাজেই শ্বেতসার অপেক্ষা স্নেহপদার্থ খাদ্য হিসাবে অধিক মূল্যবান। তাছাড়া কেবলমাত্র শ্বেতসার বা স্নেহপদার্থ খাইয়া শরীর রক্ষা হয় না। অধিক স্নেহপদার্থ খাইলে বা বেশী পরিশ্রম করিলে শরীরে অম্লসৃষ্টি হয়। উহা শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর। শ্বেতসার উহাকে নষ্ট করিয়া

শরীরের ক্ষারত্বকে (alkalinity) রক্ষা করে। আবার শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য খাইয়া একটু রৌদ্রসেবন করা ভাল, নতুবা শরীরের ক্যাল্‌শিয়াম নষ্ট হয়। শ্বেতসার অধিক পরিমাণে খাইলে প্রোটিনের অভাব পূরণ করে এবং মেদবৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা শরীরের শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারিত হয়। চাউল, ময়দা, চিনি, আলু, শাক, ডাঁটা, থোড়, মোচা প্রভৃতি নানাপ্রকার তরকারীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার থাকে।

চাউল—ইহা সুসিদ্ধ হইলে খুব সহজে হজম হয়। চাউলে B ভাইটামিন মাত্র থাকে। তাহাও আশু ধান্য বা আতপ চাউলে কম থাকে। আবার কলেছাঁটা চাউলে বা উত্তমরূপে ধোয়া চাউলে এবং যে ভাতের মাড় ফেলিয়া দেওয়া হয় সেই ভাতে ভাইটামিন থাকে না। ঢেঁকিছাঁটা (লাল) চাউলে A ও B ভাইটামিন থাকে। সেজন্যই ফেনযুক্ত ভাত এমন কি ভাতের ফেন ভাল। ফেনের মধ্যে B ভাইটামিন, শ্বেতসার ও কিছু প্রোটিন থাকে। চাউলের কুঁড়াতেও A, B ভাইটামিন থাকে। এমন কি 'তুষে'ও কিছু শ্বেতসার ও লবণজাতীয় জিনিষ থাকে। চাউলে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও লবণ কম থাকে। চাউল দ্বারা ভাত, পোলাও, পিষ্টক, পায়স প্রভৃতি বহু জিনিষ তৈয়ার হয়।

গম—গমের মধ্যে শ্বেতসার ও কিছু প্রোটিন এবং উহার মধ্যে অন্যান্য কয়েক প্রকার উপাদানও থাকে। (যথা—ভূষিতে লৌহ, ক্যাল্‌শিয়াম প্রভৃতি; ভ্রূণে প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, A ও D

ভাইটামিন ; শাঁসে গ্ল টেন ইত্যাদি)। গমেও প্রোটিন কম থাকে। গমের আটা ও ময়দা দ্বারা পাঁউরুটি, রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি তৈয়ার হয়।

যব—যবে প্রোটিন কম, কিন্তু স্নেহপদার্থ ও লবণ বেশী থাকে। অধিক সিদ্ধ করিলে উহা শর্করাতে পরিণত হয় এবং সহজে হজম হয়। ভুট্টা, বাজরা প্রভৃতিতে স্নেহপদার্থ বেশী এবং প্রোটিন কম থাকে। ইহাদের দ্বারাও নানাপ্রকার রুটি তৈয়ার হয়। তবে তাহা পাউরুটির মত উপকারী নহে এবং সহজে হজমও হয় না।

ফল, শাক ও শস্যসমূহের বিভিন্ন উপাদানের তুলনা

(শতকরা কত ভাগ)

	প্রোটিন	স্নেহপদার্থ	শ্বেতসার
সিদ্ধ চাউল	[illegible]	১	৮০
আতপ ”	৭	প্রায় ১	৭৯
আটা (যাঁতার)	১৪	২	৭২
” (কলের)	১২	৩	৬৮
ময়দা	১১	২	৭১
যব	১৩	২	৭১
তরকারী—			
গোল আলু	২	সামান্য	২১
লাল আলু	২	”	২২
ওল	২	৩	১২

	প্রোটিন	স্নেহপদার্থ	শ্বেতসার
কুমড়া	সামান্য	—	৪
ট্যাঁড়স	২	১	৬
মূলা	১	সামান্য	৬
বাঁধাকপি	২	”	”
ফুলকপি	২	·৫	৫
পালংশাক	২	৪	৩
পুঁই ”	২	·৫	৪
টমেটো	১	১	—
ফল—			
আঙ্গুর	১	১	১৪
কমলালেবু	১	২	১২
বেদানা	১	—	৭
আম	১	১	৩৪
কলা	·৫	সামান্য	২২
নারিকেল	৪	৫৬	২০
পেঁপে	১	সামান্য	৭
বাদাম	২১	৫৪	১৭
চিনাবাদাম	২৫	৫০	১৫
পেস্তা	২৩	৫১	৩
আখরোট	১৭	৬৬	১৩

লবণ

আমাদের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান লবণ। লবণ না দিলে রান্না করা জিনিষ সুস্বাদু হয় না। আমাদের শরীরে শতকরা ছয় ভাগ নানা প্রকার লবণ দ্বারা গঠিত। এই লবণের কতক অংশ প্রতিদিন প্রস্রাব, ঘাম প্রভৃতির সহিত (দৈনিক ২।৩ আউন্স পরিমাণ) বাহির হইয়া আসে। আমাদের এই অভাব প্রতিদিনই পূরণ করা দরকার। শরীরে উপযুক্ত পরিমাণ লবণের অভাব হইলে পুষ্টিসাধন, অস্থিগঠন ও পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে এবং 'স্কার্ভি' রোগ হয়। লবণের অভাব হইলে রক্তের জমাট বাঁধিবার ক্ষমতা ও তন্তু-গঠনশক্তিও নষ্ট হয়। আমরা খাদ্যদ্রব্যের সহিত কিছু লবণ খাই এবং কিছু পরিমাণ নানাপ্রকার মাছ, মাংস, তরকারী, ফল প্রভৃতির মধ্যেও পাইয়া থাকি। আমাদের শরীরে নিম্নলিখিত লবণগুলি বর্ত্তমান থাকে।

ক্যাল্শিয়াম—মানবদেহে ইহা একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় উপাদান। ইহা অস্থি ও দন্তনির্ম্মাণ এবং মাংসপেশী, স্নায়ুমণ্ডল ও হৃদ্পিণ্ডের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইহার অভাব হইলে 'রিকেট্' হয় এবং ক্ষয়রোগ বিস্তার লাভ করে। এই উপাদান দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য (ছানা, পনির, দধি), চাউল, গম, পালংশাক, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ডুমুর, পলতা, মটরশুটি, চিংড়ি, পুঁটি, মৌরলা মাছ, কমলালেবু প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যে পাওয়া যায়।

সোডিয়াম—ইহাও মাংসপেশী, স্নায়ুমণ্ডল ও হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। ইহার অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়। মসুর ডাল, পালংশাক ও আকাঁড়া চাউলে এই লবণ পাওয়া যায়।

পটাশিয়াম—ইহার কার্য্য ঠিক সোডিয়ামের মত। ইহা মটরশুটি, আলু, দুধ, গম ও বাদামে পাওয়া যায়।

ফস্‌ফরাস—ইহা শরীরের পুষ্টিসাধন, অস্থিগঠন, পেশী-সঞ্চালন এবং রক্তের ক্ষারত্ব ও প্রস্রাবের অম্লত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা দুধ, পনির, চাউল, গম, ডাল, ফুলকপি, পালংশাক, পুঁইশাক, টমেটো, কমলালেবু, মাংস, ডিম প্রভৃতি জিনিষে পাওয়া যায়।

আইওডিন—ইহাও শরীরের কর্ম্মশক্তি বৃদ্ধি করে। ইহা দুধ, টমেটো, পালংশাক, ফুলকপি, বীট, শালগম, স্যালাড্, মটরশুটি, ডিম, প্রভৃতি জিনিষে পাওয়া যায়।

লৌহ, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাগনেশিয়াম—ইহাদের অভাবে রক্ত কমিয়া যায়। এই সকল জিনিষ দুধ, পালংশাক, লেটুস, জলপাই, আলুবখরা, বাদাম, ডিম, মাংস প্রভৃতি জিনিষে পাওয়া যায়।

জল

আমরা কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিয়া যতক্ষণ বাঁচিতে পারি, জল গ্রহণ না করিয়া ততক্ষণ কিছুতেই পারি না। আমাদের শরীরে রক্ত, যকৃৎ, নানা প্রকার তন্তু, মাংসপেশী ইত্যাদির মধ্যে

জলের ভাগ খুব বেশী থাকে। জলের অভাব হইলে খাদ্য হজম হয় না, রক্তের তরলতা কমিয়া যায়, স্নায়ু ও মাংসপেশীর শক্তি কমে, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি রোগ হয়। আমাদের শরীর হইতে প্রতিদিন মলমূত্র, ঘাম প্রভৃতির ভিতর দিয়াও প্রচুর জল বাহির হইয়া যায়। এসকল অভাব পূরণ করিবার জন্য প্রতিদিন অন্ততঃ আড়াই সের জল গ্রহণ করা উচিত। এই জলের কিছু অংশ আমরা শুধু জলরূপে পান করি এবং বাকী অংশ অন্যান্য খাদ্যের (দুধ, দধি, তরকারীর ঝোল প্রভৃতির) মধ্য দিয়া গ্রহণ করি। কখনই খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উহার ঠিক পূর্ব্বে বা পরে অধিক পরিমাণে জল পান করা উচিত নহে। বারে বারে অল্প অল্প জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে খুব সকালে প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলে পেটের রোগের উপকার হয়। জল পান করিবার পূর্ব্বে জল বিশুদ্ধ কি না এবং পান করিবার পাত্র পরিষ্কার কি না তাহা দেখা দরকার। ময়লা বা দূষিত জল পান করিলে উপকারের পরিবর্ত্তে নানা প্রকার রোগ হইয়া থাকে।

ভাইটামিন

এ পর্য্যন্ত খাদ্যের যে সকল উপাদানের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে আর একটি উপাদান না থাকিলে খাদ্য কখনও পুষ্টিকর হয় না। এই শেষ উপাদানটি খাদ্যদ্রব্য যতক্ষণ টাটকা থাকে ততক্ষণই পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য ছাড়া সূর্য্যকিরণেও উহা আছে। এই উপাদানটি কি তাহা সঠিক ভাবে বর্ণনা করা যায়

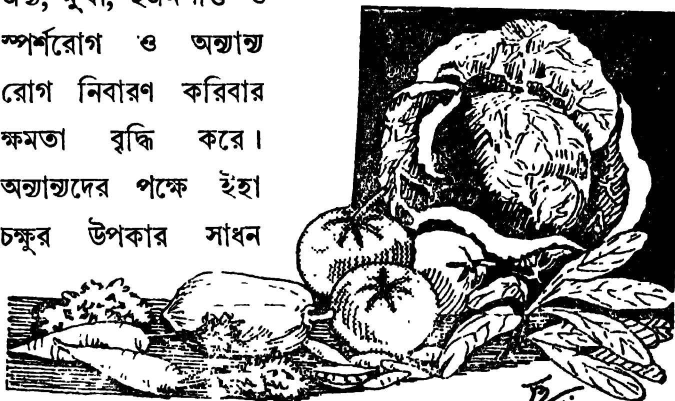
না। তবে উহার উপকারিতা এত বেশী যে উহাকে 'খাদ্যপ্রাণ' বা ভাইটামিন (Vitamin) বলা হয়। উপরে যে সকল খাদ্য-দ্রব্যের বিষয় লিখিত হইয়াছে সেগুলি বাসি অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে খাইলেও স্কার্ভি, বেরিবেরি প্রভৃতি বহু রোগ হইয়া থাকে। কিন্তু টাট্‌কা তরকারি—(যাহাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-প্রাণ থাকে তাহা) খাইলে উল্লিখিত রোগসমূহ আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। সেজন্যই এই উপাদানটি স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত দরকারী। শহর অঞ্চলে প্রচুর সূর্য্যের আলোক ও সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য টাট্‌কা পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রাম অঞ্চলে সে সকল জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেজন্য গ্রামের লোক অধিক পরিমাণে ভাইটামিন পাইয়া থাকে এবং শহরের লোকেদের মধ্যে ভাইটামিনের অভাবের জন্য নানা প্রকার রোগ দেখা যায়।

বিভিন্ন প্রকার টাট্‌কা জিনিষে এবং সূর্য্যকিরণে ভাইটামিন পাওয়া যায় এবং উহা নিম্নলিখিত কারণে নষ্ট হয়। প্রথমতঃ বাসি হইলে, খুব বেশী সিদ্ধ করিলে বা বার বার সিদ্ধ করিলে, কিংবা কোন কোন সময় উগ্র ক্ষারের (Soda) সংস্পর্শে খাদ্যপ্রাণ নষ্ট হয়। সেজন্য কতকগুলি খাদ্যদ্রব্যে ভাইটামিন থাকে না। যথা—কড়া পাকের ঘি, কলে প্রস্তুত ময়দা, চাউল প্রভৃতি (উহাদের ভাইটামিন অংশ একেবারে বাদ পড়িয়া যায়), বার্লি, এরারুট প্রভৃতিতেও ভাইটামিন থাকে না বলিলেই হয়। যে গরু মাঠে বিচরণ করিয়া প্রচুর সবুজ ঘাস খায়, তাহার দুধে যথেষ্ট ভাইটামিন

থাকে, কিন্তু শহরে ঘরে বদ্ধ এবং খইল, ভুসি মাত্র আহার প্রাপ্ত গরুর দুধে উহার পরিমাণ অনেক কম থাকে। কলে প্রস্তুত সকল প্রকার খাদ্যেই ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। সেজন্য ঐরূপ খাদ্য যথাসম্ভব না খাওয়াই ভাল।

ভাইটামিনকে তাহাদের উপকারিতা অনুসারে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা হয়।

A-ভাইটামিন—বিভিন্ন বয়সের লোকের পক্ষে ইহার উপকারিতা বিভিন্ন প্রকার। শিশুদের পক্ষে ইহা পুষ্টি-সাধনের জন্য, ক্ষুধা, হজমশক্তি ও স্পর্শরোগ ও অন্যান্য রোগ নিবারণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যান্যদের পক্ষে ইহা চক্ষুর উপকার সাধন

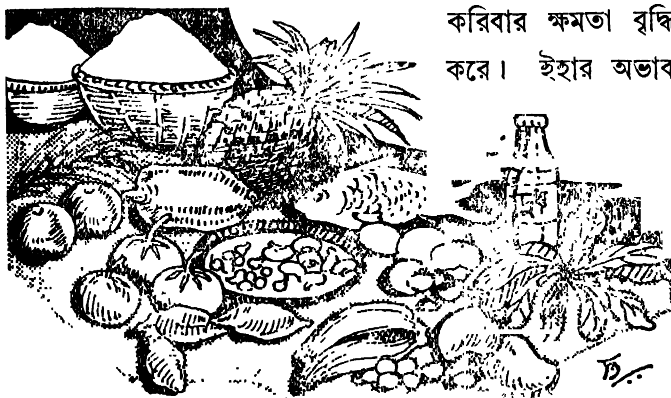


ভাইটামিন "এ"

করে। এই ভাইটামিনের অভাব হইলে বদহজম, রাত্র্যান্ধতা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ হয়। ইহা দুধ, মাখন, ঘি, টাট্‌কা সবুজ তরকারী, বিশেষতঃ পালং শাক, পাকা ফল, ডিমের কুসুম,

বীজাঙ্কুর, উদ্ভিদের শীষ, নানা প্রকার মাছের তৈল এবং পশুর চর্ব্বিতে পাওয়া যায়। এই ভাইটামিন চর্ব্বিতে (fat solluble) গলে।

B-ভাইটামিন—ইহা ক্ষুধা ও হজমশক্তি এবং দেহের পুষ্টি বিধান করে, স্নায়ুকে সতেজ রাখে এবং বেরিবেরি প্রভৃতি রোগ নিবারণ করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ইহার অভাব



ভাইটামিন "বি"

হইলে বাত, বদহজম, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগ হয়। ইহা দুধ, মাছ, ডিমের কুসুম, পালং, টমেটো, শুঁট, টাট্কা তরকারী, বীজাঙ্কুর, পাতিলেবু, চাউলের কুঁড়া, আমাজা চাউল, গম, ডাল প্রভৃতির খোসা, আম, কলা প্রভৃতি ফলে পাওয়া যায়। ইহা জলে গলে।

C-ভাইটামিন—ইহাও জলে গলে (water solluble)। দুধ, ননী, বীজাঙ্কুর, পাতি, কাগজি ও কমলা লেবু, আনারস, আপেল

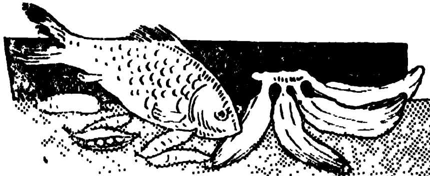
প্রভৃতি ফল, টমেটো, পালং শাক, বিলাতী বেগুন মাছের ডিম ও তেল প্রভৃতিতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। টাট্‌কা অবস্থায় ও কাঁচা খাইলে এই সকল খাদ্যদ্রব্য হইতে সি-ভাইটামিন খুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। শুকাইয়া গেলে



ভাইটামিন "সি"

উদ্ভিদ হইতে এই ভাইটামিন অন্তর্হিত হয়। অধিক উত্তাপেও এই ভাইটামিন নষ্ট হয়। ক্ষার সংযোগেও ইহা নষ্ট হয়, কিন্তু অম্ল বা টক দিলে ইহা নষ্ট হয় না। ইহা জলে গলে বলিয়া তরকারি সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে, সেই ফেলিয়া দেওয়া জলের সহিত সি-ভাইটামিনের অধিকাংশ ভাগ বাহির হইয়া যায়। এই ভাইটামিনের অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। এই রোগে দাঁতের গোড়া ফুলে, শরীরের নানা স্থান হইতে রক্ত পড়ে এবং রক্তহীনতা হয়।

D-ভাইটামিন—ইহা চর্ব্বিতে গলে। ইহার দ্বারা মাংস-পেশী, অস্থি ও দাঁত দৃঢ় হয় এবং দাঁতের রোগ, রিকেট ও ফুসফুসের রোগ নিবারিত হয়। ইহা





ভাইটামিন "ডি"

দুধ, সবুজ তরকারী, মাছ, ডিমের কুসুম, পাকা কলা, মটর শুটি প্রভৃতিতে থাকে। সূর্য্যের কিরণেও এই ভাইটামিন উৎপন্ন হয়। সেজন্য রিকেট ও ফুসফুসের রোগীব পক্ষে রৌদ্র-সেবন বিশেষ উপকারী। শিশুদিগকে রৌদ্রসেবন করাইলে উহাদের রিকেট প্রভৃতি রোগ হইতে পারে না। কারণ রৌদ্র-সেবন করিলে শরীরের মধ্যে আপনা-আপনিই ডি-ভাইটামিন উৎপন্ন হয়।

E-ভাইটামিন—ইহা চর্ব্বিতে গলে। ইহার দ্বারা মায়ের

স্তন ও ভ্রূণের দেহ-বৃদ্ধি হয় এবং সকল লোকের মানসিক



ভাইটামিন "ই"

ফূর্ত্তি হয়। ইহা ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল, ডিমের কুসুম, মাছের তৈল, লেটুস, যব, গম প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যসমূহে কি কি ভাইটামিন আছে তাহা প্রদর্শিত হইল

	A	B	D	E
আমাজা চাউল—	+	++		
গম—	++	++		

	A	B	C	D
যাঁতা-ভাঙ্গা আটা—	+	++		
যব—	+	++		
ভুট্টা—	+	++		
মসূর—	+	++		
মটর—	+	++	++	+
কাঁচা দুধ	+++	++	+	+
গরম দুধ—	+	+		++
মাখন—	+++			+++
ননী—	++	++	+	
ছানা ও ঘি	++	++		
দধি ও ঘোল—	+	+++	+	+
মাছ—	++	++		+
মাছের ডিম—	+	++		+
মাছের তেল—	+	++		
ডিম—	+++	++		
মাংস—	+	+	+	
মেটে—	++	++		
নারিকেল—	+	++		+
ডাবের শাঁস—	++	+	+	+
আনারস—	++	++	+++	
পেঁপে—	+	+	++	+

	A	B	C	D
আম—		+	+	
কমলালেবু—		++	+++	
আঙ্গুর—		++	++	
আলু—	+	++	++	
কাঁচা কলা—	+		++	
ফুলকপি—	+	++	+	+
বাঁধাকপি—	+	++	++	+
টমেটো—	+	+++	+++	+
পালংশাক—	+++	+++	+++	++
ঢেঁড়স—	+	+++	+	

সাধারণ খাদ্য

খাদ্য সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করা দরকার। যাহাদের শরীর সুস্থ, সবল এবং বয়স মাঝামাঝি এবং যাহারা অধিক পরিশ্রম করে তাহাদের পক্ষে অন্য লোক অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। খাদ্যদ্রব্য ও পাত্র পরিষ্কার থাকা উচিত। কখনও অতিরিক্ত ভোজন করা উচিত নহে। প্রত্যেক লোকের বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাওয়া উচিত। একঘেয়ে খাদ্য যেমন খাইতে রুচি হয় না, তেমনই উপকারী হয় না।

বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক সুস্থ, সবল লোকের খাদ্য নির্ব্বাচন সম্পর্কে ইহা লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে তাহার মোট পরিমাণ **২৫০০ হইতে ৩০০০ ক্যালোরি** হয়। ঐ খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন উপাদান নিম্নলিখিত হারে থাকা দরকার। (১) প্রোটিন—৭৫ হইতে ১০০ গ্রাম; (২) স্নেহ পদার্থ—৫০ হইতে ১০০ গ্রাম; (৩) শ্বেতসার—২৫০ হইতে ৫০০ গ্রাম; (৪) লবণ—ক্যাল্‌শিয়াম ২০ গ্রেণ, পটাসিয়াম ৪০ গ্রেণ, ফস্‌ফরাস ২৫ গ্রেণ; সোডিয়াম ৮০ গ্রেণ, আইওডিন, লৌহ, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কিছু কিছু পরিমাণ; (৫) জল—প্রচুর পরিমাণ। (৬) ভাইটামিন—প্রচুর পরিমাণ। এসকল খাদ্যদ্রব্য এরূপ ভাবে নির্ব্বাচন করা দরকার যাহাতে শরীরের দৈনিক অভাব পূরণ করিয়াও পুষ্টিবিধান হয় এবং ভবিষ্যতে শরীরের পুষ্টির জন্য যেন দেহের অভ্যন্তরে কিছু পরিমাণ সঞ্চিত থাকে।

দৈনিক খাদ্য

উপরিলিখিত বিষয়টি মনে রাখিয়া প্রত্যেক লোকের প্রতিদিনের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কেবলমাত্র ক্যালোরির পরিমাণ ঠিক থাকিলেই হইবে না। খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ, বিচিত্রতা প্রভৃতির প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত। খাদ্য প্রতিদিন যাহাতে একঘেয়ে না হয় তাহাও দেখিতে হয়। ক্যালোরির পরিমাণ খাদ্যের মধ্যে ঠিক থাকিলেও একই

প্রকার খাদ্য খাইতে রুচি হয় না বা খাইয়া তৃপ্তি লাভ করা যায় না। খাদ্যগ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ না করিলে তাহা দ্বারা উপকারও হয় না। আমাদের দেশের হিন্দু বিধবারা নিরামিষ খাইয়া থাকেন। অন্যান্যেরা মিশ্র খাদ্য (আমিষ ও নিরামিষ) ভোজন করেন। যাঁহারা নিরামিষ খান তাঁহাদের সম্বন্ধেও ইহা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, তাঁহারা যেন বদলাইয়া বদলাইয়া বিভিন্ন প্রকার নিরামিষ খাদ্যই গ্রহণ করেন। তাঁহাদের খাদ্যের মধ্যে মোট ক্যালোরি যেন ঠিক থাকে। অন্যান্যদের পক্ষে মিশ্র আহারই ভাল। কেবল মাত্র উদ্ভিজ্জ খাদ্য খাইতে রুচি হয় না এবং অনেক সময় হজমের পক্ষেও উহা অসুবিধাজনক। সেজন্য প্রাণীজ খাদ্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে খাওয়া উচিত।

রোগীর পথ্য

রুগ্ন ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা সুস্থ লোকের মত হয় না। আজ যে ব্যক্তি সুস্থ ও সবল বলিয়া একপ্রকার খাদ্যদ্রব্য খাইলেন, কাল তাঁহার অসুখ হইলে তাঁহাকে ঠিক সেরূপ আহার দেওয়া কখনও সঙ্গত হইবে না। অনেক সময়েই অসুস্থ অবস্থায় রোগীকে সুস্থ ব্যক্তির মত আহার দিলেও রোগী তাহা খাইতে পারে না বা খাইতে পছন্দ করে না। যদি কোন অসুস্থ ব্যক্তি জোর করিয়া সুস্থ ব্যক্তির খাদ্য গ্রহণ করে তবে অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেজন্য রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। কাহার কি প্রকার রোগ হইয়াছে এবং বয়স ও

শারীরিক অবস্থা কিরূপ, এ সকল বিবেচনা করিয়া কোন্ রোগীকে কি খাদ্য বা পথ্য দিলে উপকার হইবে তাহা বিচার করিয়া তারপর পথ্য দিতে হইবে। এবিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত তবে রোগীর পথ্য সম্বন্ধে কতগুলি সাধারণ বিষয় মনে রাখা দরকার।

রোগীকে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করিতে দিবে। রুগ্ন অবস্থায় খুব সহজে হজম হয় এমন সব পথ্য দিবে। পেটের অসুখে ডাবের জল, ঘোল, বার্লি, চিনি বা মিছরি ভিজান জল ইত্যাদি, জ্বর ইত্যাদিতে বার্লি, দুধ, শটি, সাগু প্রভৃতি এবং গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে। ফলের মধ্যে কমলালেবু, আনারস, ডালিম, বেদানা প্রভৃতি রোগীর পক্ষে উপকারী। কোন প্রকার পথ্য দেওয়ার অল্প পূর্ব্বে বা পরে ঔষধ দিবে না। রোগী সুস্থ হইয়া উঠিলে পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, টাট্‌কা মাছের ঝোল, দুধ, ঘোল ইত্যাদি খাইতে দিবে। পুরাতন রোগে এইরূপ পথ্য অনেক দিন দেওয়া প্রয়োজন। রুগ্ন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার, নতুবা মাঝে মাঝে আবার রোগের আক্রমণ হইতে পারে।

খাদ্যে ভেজাল

আমাদের খাদ্যদ্রব্যসমূহ আমরা অনেক সময়ই খাঁটি অবস্থায় পাই না। ইহার ফলে কেবল যে ঠিকমত উপকার হয় না তাহা

নহে, অধিকন্তু অনেক সময় অনিষ্ট সাধিত হয়। ব্যবসায়িগণ নিম্নলিখিত নানা কারণে খাদ্যে ভেজাল দিয়া থাকে। (১) অধিক লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীরা ভাল জিনিষের সঙ্গে খারাপ জিনিষ মিশাইয়া দেয়। (২) ঐ উদ্দেশ্যেই হালকা জিনিষের সঙ্গে কিছু ভারী জিনিষ মিশাইয়া ওজন বাড়াইয়া থাকে। (৩) কোন কোন জিনিষের সার বস্তু (যথা—দুধের মাঠা) তুলিয়া লইয়া বা তাহার সহিত জল মিশাইয়া ব্যবসায়ীরা আবার রাসায়নিক উপায়ে উহার এরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখে যাহাতে দোষ ধরা না পড়ে। (৪) কখন কখন খাবার জিনিষ যে খারাপ তাহা যাহাতে ধরা না পড়ে ঐ উদ্দেশ্যে খাদ্যদ্রব্যে নানা রকম রং, সুগন্ধ ইত্যাদি মিশাইয়া ব্যবসায়ীরা জিনিষের আসল রূপ বা প্রকৃতি লুকাইয়া রাখে।

নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যসমূহে সাধারণতঃ নানাবিধ জিনিষ ভেজাল দেওয়া হয়।

কোন্ জিনিষে সাধারণতঃ কি কি ভেজাল দেওয়া হয় তাহাও উল্লিখিত হইল।

দুধ—দুধের মাঠা তুলিয়া লইয়া তাহাকে খাঁটি দুধ বলিয়া বিক্রয় করা হয়। দুধের সহিত জল মিশাইয়া তাহাতে শটীর পালো ও বাতাসা মিশাইলে রং বা গাঢ়ত্ব ইত্যাদি ধরা পড়ে না। মহিষের দুধের সহিত জল মিশাইয়া সহজেই গরুর দুধ বলিয়া বিক্রয় করা যায়। দুধের সহিত সামান্য পরিমাণ জল মিশাইলে তাহা ধরা পড়ে না। দুধের ভেজাল ধরিবার জন্য ল্যাকটোমিটার যন্ত্র ব্যবহার হয়। দুধের ছানা তৈয়ার করিলেও ভেজাল ধরা পড়ে।

ক্ষীর—ক্ষীরের সহিত সবেদা, শটীর পালো, গুড়, কলা প্রভৃতি মিশান হয়।

মাখন—খাঁটি মাখনে শতকরা ১০।১২ ভাগ মাত্র জল থাকে, কিন্তু তাহার সহিত ২৫ ভাগ পরিমাণ জলও মিশাইয়া বিক্রয় হয়। মাখনের সহিত লবণ, দধি, নানা প্রকার চর্ব্বি, ভ্যাসেলিন, ভেজিটেবেল ঘি, নারিকেল, তিল প্রভৃতির তৈল, কচু সিদ্ধ ও কলা চট্‌কাইয়া ভেজাল দেওয়া হয়।

ঘি—ঘিয়ের সহিত ভেজিটেবেল ঘি, নানা প্রকার চর্ব্বি, নারিকেল, চীনাবাদাম, মহুয়া বীজ প্রভৃতির তৈল, সাদা ভ্যাসেলিন, আলু, কচু, কলা প্রভৃতি, সুগন্ধ দ্রব্য, লেবুর পাতা ইত্যাদি মিশান হয়।

সরিষার তৈল—সোরগুঁজা, হুড়হুড়ে বীজ, তারা বীজ, মহুয়া বীজ, তিল, তুলা প্রভৃতির তৈল, লঙ্কাচূর্ণ, মূলার রস প্রভৃতি ঝাঁজ ও গন্ধ বিশিষ্ট নানা প্রকার উপাদান মিশান হয়।

চাউল—কাঁকর, গুমো চাউল, চূণ, ক্ষুদ, কুঁড়া প্রভৃতি চাউলের সহিত মিশান হয়।

আটা, ময়দা—ভূষি, চাউলের গুঁড়া, চীনা মাটির গুঁড়া, রামখড়ি, খড়িমাটী, ঘাসের বীজ প্রভৃতির গুঁড়া, আটা ও ময়দার সহিত অনেক সময় ভেজাল দেওয়া হয়।

বার্লি—ছোলার ছাতু, শটীর পালো, রামখড়ি, চাউল প্রভৃতির গুঁড়া ও ময়দা মিশান হয়।

ডাল—রামখড়ি, চীনামাটি ও নানা প্রকার ময়লা, কাঁকর প্রভৃতি মিশান হয়।

চা—ধূলা, পূর্ব্বে সিদ্ধ করা চা, কাঠের গুঁড়া প্রভৃতি চায়ের সঙ্গে মিশান হয়।

চিনি –রামখড়ি, সুজি, বার্লি, শটীর পালো, চূণ প্রভৃতি মিশান হয়।

লবণ—চূণ, সাজিমাটী প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়।

গরম মসলা—ধূলা, নানা প্রকার আবর্জ্জনা ও এসেন্স বাহির করিবার পর ঐ সকল মসলা অনেক সময় বিক্রয় করা হয়।

পাঁপর—সোডা, সাজিমাটী মিশান হয়।

খাদ্য নির্ব্বাচন ও ব্যয়

প্রত্যেক লোকের খাদ্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধে উহার (ক্যালোরি) মূল্য নির্দ্ধারণ, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয় ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় মনে রাখা একান্ত দরকার। তাহাদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্যের সংগ্রহ এবং ব্যয় সর্ব্বপ্রধান। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে পৃথিবীর সকল স্থানে এক রকম খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না, আবার পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোকের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও ভিন্নরূপ। গরম দেশে স্নেহ জাতীয় খাদ্য কম এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বেশী দরকার। সেজন্য আমাদের দেশের লোকের পক্ষে ভাত, আলু প্রভৃতি বেশী পরিমাণ খাইয়া অল্প মাছ, মাংস খাইলেই চলে। অথচ ইউরোপের মত শীতপ্রধান দেশে অল্প পরিমাণ পাঁউরুটির (শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য) সঙ্গে অধিক মাংস, ডিম প্রভৃতি দরকার। বিভিন্ন বয়সের লোকের জন্য

বিভিন্ন প্রকার এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ খাদ্য দরকার। শিশুদের জন্য দুধ যত দরকার, অন্য কাহারও পক্ষে (রোগী ভিন্ন) তত নহে। পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা অধিক পরিশ্রম করেন এবং স্ত্রীলোকদের মধ্যে যাঁহারা গর্ভবতী অথবা যাঁহাদের সন্তান অল্প কাল পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাঁহাদের পক্ষেও দুধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। এভাবে কেবল দুধ নহে, অন্যান্য সকল প্রকার খাদ্যই বিভিন্ন বয়সের লোকের জন্য এবং বিভিন্ন অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ হওয়া দরকার।

খাদ্য বিষয়ে আর একটি প্রধান বিবেচনার বিষয় খাদ্যের মূল্য। ভারতবর্ষ শস্য উৎপাদনে পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ দেশ হইলেও এখানকার অধিবাসিগণ অন্যান্য দেশের লোকের তুলনায় অত্যন্ত গরীব। সেজন্য এখানকার লোকেরা কোন বিষয়েই অন্যান্য ধনীদেশের লোকের মত খরচ করিতে পারে না। অর্থাভাবে খাওয়ার জন্য কম খরচ করিবার ফলে এখানকার লোকেদের স্বাস্থ্য দিন দিন নষ্ট হইতেছে। ইহার ফলেই এদেশের বহু লোকের অকালে মৃত্যু হইতেছে এবং অনেকেই বহু রোগে প্রায়ই ভুগিয়া থাকে। সেজন্য প্রত্যেক লোকেরই নিজ নিজ আয় অনুসারে কি পরিমাণ অর্থ খাদ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয় করিতে পারিবে তাহা স্থির করা উচিত। তারপর ঐ ব্যয়ের মধ্যে কি ভাবে যথাসম্ভব সকল প্রকার উপাদান সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। *প্রত্যেক বয়স্ক সুস্থ লোকের জন্য দৈনিক ২৫০০ হইতে* ৩০০০ ক্যালোরি পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন। তাহার মধ্যে

প্রত্যেকের দৈনিক ৫ হইতে ১০ ছটাক শ্বেতসার, ২ ছটাক প্রোটিন, ১½ ছটাক স্নেহ জাতীয় খাদ্য এবং আধ ছটাক লবণ দরকার। এই হিসাব অনুসারে প্রত্যেকে নিজ নিজ আয় অনুসারে খাদ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিলে খাদ্যের অভাব অপেক্ষাকৃত কম হইবে। উদাহরণস্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে ছানা, মাংস, মাছ ও ডাল এ সবই প্রোটিন জাতীয় খাদ্য ; কিন্তু ডালের দাম ছানা বা মাংসের দাম অপেক্ষা স্থানবিশেষে তিন বা চারিভাগের এক ভাগ। আবার সমুদ্রের তীরে, নদীর ধারে বা খাল, বিল যেখানে বেশী, তথায় মাছের দাম ছানা বা মাংসের সিকি ভাগেরও কম। এভাবে নানা বিষয় বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ আয় তনুসারে খাদ্য সংগ্রহ করা উচিত। তাছাড়া তরকারীর খোসা, ভাতের মাড় প্রভৃতি জিনিষ সকলেই নষ্ট করে। অথচ উহাদের প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত দরকারী। ভাতের ফেন না ফেলিয়া রান্না করিলে এবং তরকারীর খোসা না ফেলিলে, অথবা তাহার খোসাদ্বারাই একটি স্যুপ তৈয়ার করিয়া খাইলে খুবই উপকার হয়। ভাতের ফেন না ফেলিয়া যাঁহারা রান্না করিতে পারেন না তাঁহারাও ফেন একটি পরিষ্কার পাত্রে রাখিয়া উহার কিছু অংশ নুন, মিষ্টি প্রভৃতি মিশাইয়া প্রত্যেককে খাইতে দিতে পারেন। গ্রামে একটু কষ্ট করিলেই কিছু শাক বা অন্য তরকারী সংগ্রহ করা যায়। প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহসংলগ্ন জমিতে কিছু তরকারী উৎপন্ন করিতে পারেন ; খালে, পুকুরে গিয়া কিছু মাছ ধরিতে পারেন।

এইভাবে গরীব লোকেরাও চেষ্টা করিলে নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারেন।

সুতরাং প্রত্যেক লোকই আহার সম্বন্ধে সতর্ক হইলে যে উহার উন্নতি বিধান করিতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ হিসাবে আমাদের সাধারণ লোকের খাদ্য নিম্নলিখিত রূপ যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত। ফেনসহ ভাত, কিছু শাক, খোসাযুক্ত ডাল, কিছু মাছ, তরকারী (খোসা ফেলিয়া দিলে তাহা দ্বারা একটি সুপ), টক ও সম্ভবপর হইলে দুধ। একটু অবস্থা ভাল হইলে ঐরূপ খাদ্যের সহিত ঘি, দুধ ও অন্য ২।১টি তরকারী এবং আরও একটু উন্নত অবস্থা হইলে ফল খাওয়া উচিত। সাধারণ লোকদেরও কেবলমাত্র দুই বেলা ভাত খাইলে চলে না। বিশেষতঃ ছোট ছেলেমেয়েদের এবং যাহারা অধিক পরিশ্রম করে তাহাদের পক্ষে সকাল বিকালে কিছু জলখাবারও চাই। চাল ভাজা, চিঁড়া বা মুড়ি খুব পুষ্টিকর খাদ্য। অথচ উহাদের দামও খুব বেশী নয়। তাছাড়া ছোলা ভাজা, অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ প্রভৃতি ও সামান্য ফল (পেয়ারা, কলা প্রভৃতি একটু চেষ্টা করিলেই সংগ্রহ করা যায়) সাধারণ লোকেরও জলখাবার হিসাবে খাওয়া উচিত।

উপরিলিখিত বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যাহাতে টাট্‌কা হয় তাহা লক্ষ্য করা দরকার। সাধারণ লোক বেশী দিন খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারে না। কাজেই ইহাতে তাহাদের অসুবিধার মধ্যেও একটু সুবিধাই আছে। কারণ টাট্‌কা জিনিষে যে

পরিমাণ ভাইটামিন থাকে তাহা বাসি জিনিষে থাকে না। এই সকল খাদ্যদ্রব্য ছাড়া প্রত্যেক লোকেরই প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। পরিষ্কার জল প্রত্যেকেই পান করিতে পারে এবং তাহা প্রচুর পরিমাণে পান করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কিছু সাহায্য হয়।

ভাণ্ডার ও খাদ্য-ব্যবস্থা

খাদ্যদ্রব্যসমূহ টাট্‌কা এবং প্রচুর হইলেও বাড়ীতে আনিবার পর সেগুলিকে ঠিকভাবে রাখিতে না পারিলে বহু বিপদ ঘটিতে



আদর্শ ভাঁড়ার ঘর

পারে। এই সকল জিনিষ ঠিকভাবে রাখিবার উদ্দেশ্যে বাড়ীতে ভাণ্ডার বা ভাঁড়ার ঘর রাখা দরকার। অথচ অনেক লোকই এই বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা বুঝেন না বলিয়া বাড়ীতে কোন

ভাঁড়ারের ব্যবস্থা রাখেন না। ফলে তাঁহারা জিনিষপত্র যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ফেলিয়া রাখেন। ইহার ফলেই নানা প্রকার অসুবিধা ও রোগাদি হইয়া থাকে।

চাউল, ডাল, আটা প্রভৃতি জিনিষ বহু লোকই অধিক দিনের (কেহ কেহ বৎসরের, অন্ততঃ পক্ষে ২।১ মাসের মত) জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন। সুতরাং উহাদের পরিমাণ নিতান্ত কম হয় না। কাজেই ঐ সকল জিনিষ রাখিবার জন্য ভাঁড়ার ঘর বেশ বড় হওয়া প্রয়োজন। তারপর সেই ঘরখানা স্যাঁৎস্যাঁতে বা অন্ধকার হইলে খুব খারাপ হইবে। ঐ ঘরখানা বেশ শুকনা, খট্‌খটে হওয়া দরকার। ঐ ঘরে বিভিন্ন জিনিষ রাখিবার, সাজাইবার, রাখিবার জন্য উঁচু মাচা বা অন্য কোন ব্যবস্থা রাখা দরকার। ঘরে বেশ ভাল আলো বাতাস যাহাতে প্রবেশ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বড় দরজা জানালা রাখা উচিত। আবার যাহাতে আরশুলা, ইন্দুর প্রভৃতি ঘরে যাইতে না পারে সেজন্য জানালা দরজায় জাল থাকা দরকার। ঐ ঘরেতে যাহাতে ঝুল, ধুলা, বালি ইত্যাদি না জমে সেজন্য নিয়মিত ভাবে ঝাঁট দিবে। ঐ ঘরের মেঝে মাঝে মাঝে লেপিয়া ফেলিতে হইবে। মোটকথা ঐ ঘর সম্বন্ধে অন্য ঘরের মতই যত্ন লওয়া উচিত। সম্ভবপর হইলে ঐ ঘরখানা পাকা, বা অন্ততঃ পক্ষে মেঝেটি পাকা করা দরকার।

তরকারি, ফল ইত্যাদি কেহই অধিক পরিমাণে কিনিয়া রাখে না, কারণ এই সকল জিনিষ সহজেই নষ্ট হয়। তবে নারিকেল,

সুপারী প্রভৃতি অনেক দিন থাকে বলিয়া ঐ সকল জিনিষ কিছু বেশী পরিমাণে কেহ কেহ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। ঐ সকল জিনিষ, তৈল, মসলা, ঘি, তরকারী প্রভৃতি রাখিবার জন্য একটি আলাদা ঘর রাখা দরকার। অন্ততঃ পক্ষে একই ভাঁড়ার ঘরে রাখিতে হইলে উহার মধ্যেই একটি বেড়া বা দেওয়াল তুলিয়া দিয়া নারিকেল সুপারি প্রভৃতি রাখার জায়গাটি পৃথক করিয়া লওয়া উচিত।

তৈল, ঘি, কাসুন্দি, আচার প্রভৃতি রাখিবার জন্য মাটীর বয়ম বা কোন কোন ক্ষেত্রে টিনের কৌটা ব্যবহার করা উচিত। দুধ রাখিবার জন্য মাটীর কড়া বা লোহার কড়া, হাঁড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যাহাতে বিড়াল ঐ সকল জিনিষ খাইতে না পারে বা অন্য কোন প্রকার পোকা না পড়ে, বা ধূলা বালি না পড়ে সেজন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার।

রন্ধন

আমরা যে সকল খাদ্য খাইয়া থাকি তাহাদের বেশীর ভাগই রান্না করিয়া খাই সুতরাং রন্ধনের সহিত আমাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

রান্নাঘর

ভাঁড়ার বা ভাণ্ডারের মত রান্নাঘরখানাও যাহাতে আলোবাতাসযুক্ত স্থানে হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহার কারণ ঐ রান্নাঘরে সকল জিনিষ রান্না হয়, দ্বিতীয়তঃ বাড়ীতে যিনি রান্না

করেন তাঁহাকে সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ ৭।৮ ঘণ্টাকাল ঐ ঘরে থাকিতে হয়। সুতরাং তাঁহার এবং বাড়ীর অন্য লোকের স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া রান্না ঘরখানা যাহাতে ভাল হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। রান্নাঘরখানা বেশ বড় হওয়া দরকার। তারপর ঐ ঘর হইতে যাহাতে ধূম সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। ঐ ঘরঘানা খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে। সেজন্য ঘরখানা রোজই ভাল করিয়া মুছা দরকার এবং ঘরে যাহাতে ধূলা, ঝুল ইত্যাদি না জমিতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। রান্নাঘরে সকল সময় জল থাকে এবং অনেক সময়ই জল পড়ে। কাজেই রান্নাঘরের মেঝে পাকা হওয়া ভাল এবং জল যাহাতে সহজে বাহির হইয়া যাইতে পারে সেজন্য ঘরখানির ঢাল ভাল রাখিবে এবং জল বাহির হইয়া যাইবার জন্য নালি রাখিবে। বাড়ীতে যিনি রান্না করিবেন তাঁহার হাত, পা, কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার থাকিবে। তাঁহার হাত মুছিবার এবং বাসনপত্র মুছিবার জন্য আলাদা গামছা বা ন্যাকড়া রাখিতে হইবে। তাঁহার গায়ের ঘাম যাহাতে কিছুতেই রান্নায় না পড়ে সে বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। প্রত্যহ রান্না করিবার পরেই রান্নাকরা জিনিষ-সমূহ অন্যত্র সরাইয়া ঢাকিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উনুনের নিকটে থাকিলে অধিক উত্তাপে ঐ সকল জিনিষ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

রান্নাঘর ও খাওয়ার ঘর আলাদা হওয়া দরকার। খাওয়ার ঘরও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে। আমাদের দেশে মাটির উপর

আসন পাতিয়া বসিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। আর পাশ্চাত্য দেশে টেবিল চেয়ারে খাওয়া হয়। খাওয়ার পূর্ব্বে ঘরখানা ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে এবং খাওয়ার পরে আবার থালা, বাসন ইত্যাদি ধুইয়া ফেলিবে ও ঘরখানার সকল আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিয়া ঘরখানা মুছিয়া ফেলিবে।

রান্না করা সম্বন্ধে রাঁধুনীর যথেষ্ট সাবধানতা ও মনোযোগ থাকা দরকার। রান্না করা জিনিষ যাহাতে সুস্বাদু অথচ সহজে হজম হয় তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইবে। তারপর সেই সকল জিনিষ যাহাতে নষ্ট না হয়, বা তাহাতে কোন প্রকার আবর্জ্জনা, ধূলা, পোকা ইত্যাদি না পড়ে সে বিষয়ে তাঁহার সাবধান হওয়া দরকার। ঐ সকল জিনিষ সেজন্যই ভালভাবে ঢাকিয়া রাখা উচিত।

জ্বালানী কাঠ, কয়লা ইত্যাদি

কাঁচা জিনিষ অপেক্ষা রান্না করা জিনিষ খাওয়ার পক্ষে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। রান্না করা জিনিষ সহজে হজম হয়, উহা খাইতে সুস্বাদু হয়। উহা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় না এবং খাদ্যের মধ্যে যদি কোন রোগজীবাণু থাকিয়া থাকে তাহা রান্নার সময় আগুনের উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। অপরদিকে রান্নার ফলে অনেক ক্ষতিও হয়। প্রথমতঃ রান্নাকরা জিনিষকে অতিরিক্ত সুস্বাদু করিবার জন্য তাহাতে অতিরিক্ত ঘি, তৈল, মসলা প্রভৃতি দিয়া তাহাকে গুরুপাক করা হয়। তারপর অধিক সিদ্ধ করার

ফলে অনেক জিনিষের ভাইটামিন নষ্ট হয়। রান্নার উদ্দেশ্যে তরকারী প্রভৃতি যে ভাবে কাটা হয় তাহাতে তাহাদের খোসা চলিয়া যায় বলিয়াও অনেক সারবস্তু কমিয়া যায়। রান্না করা নরম জিনিষ খাওয়ার ফলে দাঁতের কাজ কমিয়া যায় এবং ফলে কখন কখন দাঁত নড়ে এবং গিলিয়া খাওয়ার ফলে পেটের পীড়া হয়। রন্ধন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার। তাড়াতাড়ি রান্না করিবার জন্য আজকাল শহরের প্রায় সর্ব্বত্র এবং পাড়াগাঁয়েও কোন কোন স্থানে পাথুরিয়া কয়লা ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই কাঠ, ঘুঁটে, পাটকাঠি ইত্যাদি দ্বারা রান্না করা হইত। আজকাল বন কাটিয়া ফেলাতে বা জিনিষপত্র আনা-নেওয়ার অসুবিধার ফলে সহরে কাঠ পাওয়া কষ্টকর। অথচ কাঠের বা ঘুঁটের রান্না কয়লার রান্না অপেক্ষা উপকারী। কয়লার গ্যাস রাঁধুনী ও রান্নাকরা জিনিষ উভয়ের পক্ষে অনিষ্টকর। তাছাড়া কয়লা ধরাইবার সময় যে ঘুঁটে, কাঠ প্রভৃতি দেওয়া হয় তাহা জ্বলিবার সময় ভয়ানক ধোঁয়া হয়। উহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ঐ ধোঁয়া নিবারণ করিবার জন্য কাঠ কয়লা ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া ঘুঁটে জমির সাররূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উহা পোড়াইয়া না ফেলিয়া জমিতে সাররূপে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

রান্নার জন্য উনুন সম্পর্কেও একটু অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। যে কোন রকম উনুন হইলেই রান্না করা চলে না। কাঠের উনুন ও কয়লার উনুন সম্পূর্ণ পৃথক কয়লার উনুনের নীচ দিয়া

আগুন দেওয়ার জন্য একটি ফাঁক থাকে, মাঝখানে কতগুলি লোহার শিক বিছাইয়া দেওয়া থাকে। তাহাদের উপরে ঘুঁটে কাঠকয়লা পাথুরিয়া কয়লা প্রভৃতি দেওয়া হয়। আর কাঠের উনুনে উপর হইতে বা একপাশ হইতে কাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। উভয় প্রকার উনুনেই উপরের মুখটি খুব বেশী প্রশস্ত হইলে হাঁড়ি তাহার মধ্যে বসিয়া যায় এবং রান্নার পক্ষে অসুবিধা হয়। ভিতরের গহ্বরটি বেশ বড় হইলেই ভাল। শহর অঞ্চলে কতক লোক বৈদ্যুতিক বা গ্যাসের ষ্টোভে এবং কেহ বা কেরোসিনের ষ্টোভে রান্না করে। কেরোসিনের ষ্টোভে অধিক লোকের রান্না করা যায় না, কিন্তু অন্য দুই প্রকার উনুনে তাহা সম্ভবপর। উহাতে অল্প সময়েও রান্না হয়।

বাসনপত্র

পূর্ব্বকালে সাধারণ লোকের বাড়ীতে সকল প্রকার জিনিষই মাটির বাসনে রান্না হইত এবং রান্না করা জিনিষ কাঁসা, পিতল প্রভৃতির বাসনে রাখা হইত। আজকাল লোহার কড়া, পিতলের ডেক্‌চি, এলুমিনিয়াম প্রভৃতির বাসনে রান্না হয় এবং নানাপ্রকার ধাতুর বাসনে তাহা রাখা হয়। নিম্নে কয়েক প্রকার বাসনের সুবিধা অসুবিধার বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল।

মাটির বাসন—এই প্রকার বাসনের দাম সবচেয়ে কম বলিয়া একটুকু ময়লা হইলেই পুরাতন বাসন পরিবর্ত্তন করা সম্ভবপর। এই সকল বাসনে সকল প্রকার জিনিষ রান্না করা চলে এবং রাখাও সম্ভবপর। তবে সহজে ভাঙ্গিয়া যায় বলিয়া খুব সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়।

পাথর—টকদ্রব্য পাথরের বাসনে অনেক সময় রাখা হয়। হিন্দু বিধবারা পাথরের বাসনে রান্না করা জিনিষ রাখেন ও খান।

কাচ, চীনামাটি—কাচের বাসন বাঙ্গালীর গৃহে সাধারণতঃ খুব অল্পই ব্যবহার করা হয়। তবে মুসলমান ও সাহেবদের মধ্যে চীনামাটির বাসন অধিক ব্যবহৃত হয়। এই সকল বাসন খুব মসৃণ ও পরিষ্কার থাকে।

লৌহ—লৌহের কড়াতে আজকাল শহর ও পাড়াগাঁয়ের অনেক বাড়ীতেই রান্না হয়। এরূপ পাত্র সহজে ভাঙ্গে না, দামও বেশী নহে। কিন্তু এসকল পাত্রের রান্না জিনিষ বেশী দিন ব্যবহার করিলে কোষ্ঠকাঠিন্য রোগ হইয়া থাকে। মাজিলে লৌহবাসন সুন্দর হয়। মরিচা ধরিলে ঐ বাসন ব্যবহার করা অনিষ্টকর।

তামা, পিতল—এরূপ বাসনে টক জিনিষ রান্না হয় না বা রাখা যায় না। অন্যান্য জিনিষ রান্না করা চলে। তবে অধিকক্ষণ সিদ্ধ করা প্রয়োজন হইলে এইরূপ পাত্র ব্যবহার করা উচিত নহে। এরূপ বাসন মাজিলে খুব পরিষ্কার হয়।

কাঁসা—কাঁসার বাসনে খাওয়া বা জিনিষ রাখা চলে। এই বাসন মাজিলে খুব চক্‌চকে হয়।

এলুমিনিয়াম—এরূপ বাসনের দাম কম এবং জিনিষও খুব হাল্কা। এইরূপ বাসন রান্না করার জন্য ও রাখার জন্য খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহা বেশী দিন ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বলিয়া মাঝে মাঝে শুনা যায়।

এনামেল—এনামেল করা বাসন রান্না করা ও রাখার জন্য সর্ব্বদাই

ব্যবহৃত হয়। এনামেল কোন কারণে উঠিয়া গেলে ঐরূপ পাত্র ব্যবহার করা উচিত নহে।

নিকেল—পিতলের বাসনের উপর নিকেল করা পাত্র অনেক সময় রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে টক ইত্যাদি রান্না করিবার অসুবিধা অনেকটা দূর হয়।

কলাই করা বাসন—এরূপ বাসন সস্তা, কিন্তু কলাই সহজেই উঠিয়া যায় বলিয়া ইহার ব্যবহারে সাবধান হওয়া উচিত।

সোনা-রূপার বাসন—এরূপ বাসন নিত্য ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী নহে। তবে পোষাকী জিনিষ হিসাবে মাঝে মাঝে ব্যবহার করা চলে।

কাঠের বাসন—এ সকল জিনিষ খুব সহজে ভাঙ্গে না। কিন্তু পরিষ্কার করা কষ্টকর বলিয়া এরূপ জিনিষ অধিক ব্যবহার করা উচিত নহে।

উপরে যে সকল বাসনের বিষয় লিখিত হইল তাহাদের ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া দরকার। পাত্র-গুলিতে যথাসম্ভব ঢাকনা থাকা দরকার। তারপর উহাদিগকে যাহাতে ব্যবহারের পূর্ব্বে ও পরে উত্তমরূপে মাজিয়া পরিষ্কার করা হয়, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। ধাতু নির্ম্মিত বাসনগুলি টকদ্রব্য, উনুনের ছাই প্রভৃতি দ্বারা মাজিলেই পরিষ্কার হয়। লৌহের বাসন মাঝে মাঝে ঝামা দিয়া মাজিলে আর কালির দাগ থাকে না। চীনামাটি, কাচ প্রভৃতির বাসন সাবান জলে ধুইয়া ফেলিতে হয়। মাঝে মাঝে ধাতুর বাসনসমূহ ভিনিগার,

হোয়াইটিং, ব্রাসো প্রভৃতি দ্বারা মাজিয়া ফেলিলে বাসন খুব ভাল থাকে। বিভিন্ন প্রকার তরকারী রাখিবার জন্য বা পরিবেশন করিবার জন্য একই পাত্রকে বার বার ধুইয়া ব্যবহার না করিয়া পৃথক পৃথক পাত্র ব্যবহার করা উচিত। পরিবেশন ও রন্ধনের হাতা, চামচ প্রভৃতি পৃথক্ হওয়া ভাল।

জল রাখিবার জন্য মাটির কুঁজো, কলসী প্রভৃতি বা টিনের ড্রাম ব্যবহার করা উচিত। প্রত্যহ ঐ পাত্রের ভিতর ও বাহির উত্তমরূপে না মাজিলে শেওলা জমিয়া থাকে। মাঝে মাঝে ঐ সকল পাত্র রৌদ্রে দিয়া শুকাইতে হয়। মোটের উপর সকল প্রকার বাসনই পরিষ্কার রাখিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্ হওয়া দরকার, কারণ ঐ সকল বাসনের দোষে অনেক সময় নানাপ্রকার রোগের সৃষ্টি হইতে দেখা যায়।

প্রশ্ন

1. What are the points to be remembered with regard to the diet of a patient? (C. U.—1942).
2. What is Vitamin? Name some common food in which Vitamins A and D predominate. (C. U. —1942).
3. State how one can distinguish a fresh egg from a stale one. Describe some methods in common use for the preservation of eggs. (C. U.—1943).
4. State how good tea is made. Describe the effects of tea drinking upon the human system. (C. U. —1943).

5. Give a list of the foods that as a good house-wife you should try to serve to every member of your household everyday. Mention the approximate quantity of each article against it. (C. U.—1943).
6. Write what you know about wholesome food and healthy eating habits. (C. U.—1943).
7. How is rice commonly prepared in you family? State what is lost when rice water is thrown away. Describe three other dishes in which rice is the main ingredient. (C. U.—1944).
8. What are the ingredients in a loaf of wheaten bread? What other kinds of bread are there and why is one to be preferred to another? (C. U.—1944).
9. State how you would prepare any two of the following invalid diets :—
   (a) Milk jelly ; (b) Whey (chhanar jual) ; (c) Egg, milk and brandy ; (d) Meat broth ; (e) Vegetable soup. (C. U.—1944).
10. State how the adulteration of milk may be best detected? (C. U.—1944).
11. State how thrift may be exercised in regard to food, clothing, furniture, fuel and lighting? (C. U.—1944).

চতুর্থ অধ্যায়

গার্হস্থ্যনীতি

গার্হস্থ্যনীতি খুব সহজ বিষয় নহে। ইহার উপর সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সেজন্য মেয়েদের পক্ষে গৃহস্থালী সম্বন্ধে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা করা প্রয়োজন।

খুচরা জমাখরচের খাতা

বাড়ীর কর্ত্তা এবং অন্যান্য পুরুষগণ সাধারণতঃ চাকুরী বা ব্যবসা করিয়া, অথবা কঠোর পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। ঐ অর্থের ব্যয় সম্বন্ধে তাঁহারা কতকগুলি সাধারণ নির্দ্দেশ দিয়া মোটামুটি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহাদের পক্ষে লক্ষ্য করা সম্ভবপর নহে। ঐ সকল বিষয়ে পরিবারের স্ত্রীলোকগণের উপর নির্ভর করিতে হয়। দৈনিক কি পরিমাণ চাউল, ডাল, তৈল, লবণ, মাছ, তরকারী, মসলা ইত্যাদি দরকার, হঠাৎ দুই একজন আত্মীয় বাড়ীতে আসিলে, কোন জিনিষ কতটুকু বেশী লাগিবে, কেহ অসুস্থ হইলে কোন্ জিনিষ লাগিবে ইত্যাদি সকল বিষয় স্ত্রীলোকগণেরই হিসাব রাখা দরকার। তাহা হইলে ঐ হিসাব দেখিয়া পুরুষগণ মাসিক ও বাৎসরিক প্রয়োজন ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে পারেন এবং সেভাবে জিনিষপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

এ সকল বিষয় স্ত্রীলোকগণ লক্ষ্য না থাকিলে চাকর, ঝি বা ছেলেমেয়েরা কোনও জিনিষ নষ্ট করিতেছে কিনা এবং করিলেই বা কতটুকু নষ্ট করিতেছে, তাহা কিভাবে বন্ধ করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে পুরুষগণের পক্ষে কোন প্রকার সুব্যবস্থা করা সম্ভবপর নহে।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বাড়ীর স্ত্রীলোকগণের পক্ষে একটি খুচরা জমা-খরচের খাতা রাখা দরকার। তাহাতে তাঁহারা উপরি-লিখিত বিষয়সমূহ লিখিয়া রাখিবেন। বাড়ীতে কাহাকে কখন কি দেওয়া হয়, বা কি উপলক্ষে কখন কি খরচ হয় তাহাও জমা খরচের খাতায় লিখিয়া রাখা দরকার। ধোপা, গয়লানী, মেছুনী, ঝি, চাকর প্রভৃতিকে স্ত্রীলোকগণই অনেক সময়ে টাকা পয়সা দিয়া থাকেন এবং অনেক জিনিষ তাঁহারাই তাঁহাদের ছেলেমেয়ে বা বাড়ীর ঝি চাকরের দ্বারা কিনাইয়া থাকেন। কখন কখন বা নিজেরাই ফেরীওয়ালার কাছ হইতে কোন কোন জিনিষ কিনেন। ঐ সকলের হিসাবও স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের খুচরা জমাখরচের খাতায় নির্দ্দিষ্ট তারিখে লিখিয়া রাখিবেন।

হিসাব রাখা

অনেক সময়ে কোন কোন লোক বলেন যে তাঁহাদের কোন হিসাব নাই। ইহা ঠিক নহে। হয়ত তাঁহারা হিসাব ঠিক মত লিখেন না, কিন্তু মনে মনে একটা হিসাব তাঁহারাও অবশ্যই করিয়া থাকেন। কাজেই হিসাব ঠিক মত লিখিয়া রাখিলেই ভাল।

হিসাব লিখিয়া রাখিলে কাহার কোন বিষয়ে কত আয় এবং কত ব্যয় তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়।

প্রত্যেক লোকই নিজ নিজ আয় অনুসারে ব্যয় করেন। আয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় করিতে গেলেই ধার করিতে হয়। তাহা উচিত নহে। সুতরাং সকলের নিজ অবস্থা অনুসারে কোন্ বিষয়ে কত ব্যয় করা সম্ভবপর তাহা স্থির করিবার জন্য হিসাব রাখা দরকার। আয়-ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব পুরুষগণ রাখিয়া থাকেন, কিন্তু খুচরা হিসাব মেয়েদের পক্ষে রাখাই অধিকতর সুবিধাজনক।

হিসাব রাখিবার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথমতঃ জমা বা আয় এবং দ্বিতীয়তঃ ব্যয় বা খরচ। একথা সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে যাহার যেরূপ আয়ই হউক না কেন, তাহাকে ঠিক সেই অনুপাতেই খরচ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক লোকেরই এমন কতকগুলি বিষয়ে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু ব্যয় হয় যাহার সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে কোন প্রকার ধারণা করা সম্ভবপর নহে। তাছাড়া প্রত্যেকেরই কিছু সঞ্চয় করা উচিত।

জমা—প্রত্যেক পরিবারের বিভিন্ন লোক চাকুরী করিয়া, ব্যবসা করিয়া, বা নানাপ্রকার শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া, উহা বিক্রয় করিয়া বা অন্য যে ভাবে হউক কি পরিমাণ টাকা উপার্জ্জন করেন তাহা 'জমার' ঘরে লিখিতে হয়। বড়লোকেদের জমিদারীর আয়, ব্যাঙ্কের টাকার সুদ, কোম্পানীর শেয়ারের

লভ্যাংশ প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্থ আয় হয়। তাঁহাদের ঐরূপ সকল প্রকার আয়ের পরিমাণ জমার ঘরে জমা করা উচিত। দিন-মজুর, জেলে, ধোপা, নাপিত, গ্রাম্য পুরোহিত, নৌকার মাঝি, গরুর গাড়ীর চালক প্রভৃতি সকলকেই নিজ নিজ আয়ের পরিমাণ জমা করিতে হইবে। নতুবা সংসারের মোট আয় সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হইবে না। জমার পরিমাণ ঠিক না হইলে, ব্যয়ের পরিমাণও ঠিক করা যাইবে না।

খরচ—প্রত্যেক পরিবারের বিভিন্ন কাজে কি কি খরচ হয়, তাহারও সঠিক হিসাব রাখা দরকার। খরচ করিবার সময় আয়ের পরিমাণ দেখিয়া খরচ করিতে হইবে। প্রত্যেক সংসারেই খাওয়া, কাপড় জামা প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষপত্রের জন্য কিছু টাকা খরচ হইবেই। কিন্তু রোগের চিকিৎসা, কোন স্থানে যাতায়াত প্রভৃতি বিষয়ের খরচ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতে অনেক সময়ই কোন প্রকার ধারণা করা যায় না। প্রত্যেক সংসারে এসকল আকস্মিক খরচ সম্বন্ধেও ব্যবস্থা থাকা দরকার। লেখাপড়া, বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে ধারণা করা যায় এবং সেজন্য কিছু কিছু জমান দরকার। এ সকল বিভিন্ন কাজে ব্যয় ছাড়া প্রত্যেক পরিবারেরই কিছু সঞ্চয় করা দরকার, তাহাও হিসাবের মধ্যে লেখা উচিত।

উপরিলিখিত বিভিন্ন বিষয় মনে রাখিয়া একটি মধ্যবিত্ত গ্রাম্য পরিবারের জমাখরচের হিসাব কি ভাবে রাখিতে হয় তাহা নিম্নে দেখান হইল। মনে কর ঐ পরিবারে ৩ জন বয়স্ক পুরুষ,

৩ জন বয়স্কা স্ত্রীলোক এবং ৫টি ছেলেমেয়ে ও একটি চাকর আছে।

জমা—

ব্যবসায়ে লাভ	৫২৲
মাহিনা	৪৮৲
ব্যাঙ্কের সুদ আদায়	২৲
হাতে উদ্বৃত্ত	৩৲
মোট	১০৫৲

খরচ—

খাওয়া বাবদ—

চাউল ২/০	১২৲
ডাল ৸০	৪৲
তৈল /৫	১৸৶০
ঘি /১	১৷০
চিনি /৫	১৷০
গুড় /৭	৸৶০
দুধ ১/	৬৷০
মুড়ি, চিঁড়া প্রভৃতি	২৲
আটা ।০ সের	২৷০
মসলা (হলুদ, লঙ্কা, জিরা, ধনে প্রভৃতি)	২৲
তরকারী	৫৲
মাছ, মাস প্রভৃতি	৫৲
সাগু, মিশ্রী ইত্যাদি	১৷০
	৪৬৲

ইজা—		ইজা—	
জমা	১০৫৲	খরচ	৪৬৲
		পোষাক বাবদ—	
		ধুতি, সাড়ী, জামা, গামছা, জুতা, ছাতা, বিছানা, ইত্যাদি — হিসাব করিয়া বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন জিনিষ কিনিবার জন্য গড়ে	৮৲
		বাড়ী ঘর মেরামত ইত্যাদি বাবদ—	
		খাজনা, মেরামত, নূতন ঘর তৈয়ার ইত্যাদি — হিসাব করিয়া মাসে গড়ে	৬৲
			৬০৲

ইজা—		ইজা—		
জমা	১০৫৲	খরচ		৬০৲
		ছেলেপিলেদেয় শিক্ষা বাবদ		
		মাহিনা, বই, কাগজ, পত্র প্রভৃতি	গড়ে মাসিক	৭৲
		পারিবারিক অন্যান্য খুচরা খরচ বাবদ—		
		কাঠ		৩৲
		কেরোসিন		১॥০
		ধোপা		২৲
		নাপিত		১৲
		চাকরের মাহিনা		৪৲
		সামাজিকতা, দান, পূজা-পার্ব্বন ইত্যাদি বাবদ—		
		চাঁদা, দান, পূজা প্রভৃতি	মাসিক	৫৲
				৮৩॥০

ইজা-		ইজা—	
জম	১০৫/	খরচ	৮৩৷৹
		জীবন বীমার প্রিমিয়াম	৫৲
		ব্যাঙ্কে জমা	৮৲
		যাতায়াত খরচ	২৲
		আকস্মিক খরচ	৩৷৹
		হাতে উদ্বৃত্ত	৩৲
		মোট	১০৫

উপরের হিসাব রাখিবার নমুনা অনুসারে মাসের সাধারণ হিসাব রাখা যাইতে পারে। তাহা অপেক্ষা বিস্তৃত হিসাব খুচরা হিসাবের খাতায় লেখা ভাল। তাহাতে প্রত্যেক দিনের বিভিন্ন খাতের জমা খরচ লিখা উচিত যথা—

১৩৫০ বাং ৭ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার

২১শে মে ১৯৪৪ ইং

ইজা—		ইজা—	
জমা	৬১৷৶৹	খরচ	৫৩৸৹
দোকান হইতে		আম	।১০
দেওয়া হয়	৫৲	মুড়ি	৵১০
মোট	৬৬৷৶৹		৫৪৷৹

ইজা—		ইজা—	
জমা	৬৬৸৶০	খরচ	৫৫৷০
		কেরোসিন	৷৶০
		জীবন বীমার প্রিমিয়াম	৫৲
		মাছ	৶১০
		কাঁচকলা	৴০
		পটল	৴১০
		হলুদ	৶১০
		হাতে উদ্বৃত্ত	৬৷৶১০
		মোট	৬৬৷৶০

পারিবারিক বাজেট

সকল পরিবারেরই আয় ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হিসাব অনুসারে করা উচিত। খরচ ও আয়ের হিসাব অনুসারে বাজেট করা হয়। বাজেট তৈয়ার করিবার সময় পূর্ব্ব হইতেই ঐ বৎসরে মোটামুটি কি কি খরচ হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার। এরূপ হিসাবের জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের হিসাবের খাতা দেখা দরকার। পূর্ব্বে যে পরিবারের মাসিক হিসাব দেখান হইল তাহার বাৎসরিক বাজেট এরূপ হইতে পারে।

জমা		খরচ	
মাহিনা—		খাওয়া বাবদ—	
	৪৮ × ১২ = ৫৭৬৲		৪৫৲ × ১২ = ৫৪০৲
দেকান আয়—		পোষাক —	১০০৲
	৫০৲ × ১২ = ৬০০৲	বাড়ীঘর—	৭০৲
ব্যাঙ্কের সুদ—	২৫৲	ছেলেমেয়েদের শিক্ষা	৮০৲
		খুচরা খরচ —	১২৫৲
মোট	১২০১৲	সামাজিকতা, দান প্রভৃতি	৬০৲
		জীবন বীমা—	৬০৲
		ব্যাঙ্কে জমা—	১০০৲
		যাতায়াত—	২৫৲
		আকস্মিক খরচ—	৫০৲
			১২০০৲

এরূপ বাজেট করিবার সময় প্রত্যেক লোকের বাৎসরিক আয় কত হইতে পারে তাহার হিসাব করা উচিত এবং তাহা অপেক্ষা ব্যয় যাহাতে বেশী না হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। উপরে যে পরিবারের বিষয় লিখিত হইল তাহার মাসিক আয় গড়ে ১০০৲ (কারণ বাৎসরিক আয় ১২০১৲)। সুতরাং তাহার মাসিক ব্যয় গড়ে ১০০৲ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। তাহা হইলেই বাৎসরিক ব্যয় ও ১২০০৲ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। এভাবে বাজেট করিলে ঐ পরিবারে বিশেষ কারণ

ছাড়া ঋণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না এবং অভাব অভিযোগও অনেকটা মিটাইয়া ফেলা যায়। কিন্তু যাঁহারা এভাবে বাজেট না করেন বা কোন হিসাবপত্র না রাখেন, তাঁহাদের অনেক. সময় নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ও অযথা ঋণ করিয়া বিপদে পড়িতে হয়।

সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক পরিবারেরই নিজ নিজ আয় অনুসারে কিছু কিছু সঞ্চয় করা উচিত। সাধারণ নিয়ম অনুসারে মোট আয়ের ১/১০ অংশ সঞ্চয় করা উচিত। কিন্তু যাহাদের আয় কম তাহাদের পক্ষে ঐরূপ সঞ্চয় করা কষ্টকর। অথচ তাহাদের পক্ষেই সঞ্চয় করার প্রয়োজন বেশী। কারণ তাহাদের সকল সময়েই নানা কারণে নানারকম অভাব অভিযোগ উপস্থিত হয় এবং তখন তাহাদের ঋণ করা ভিন্ন অন্য উপায়ে অভাব মিটান সম্ভবপর হয় না। সেজন্য কষ্ট হইলেও প্রথম হইতেই তাহাদের কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করা উচিত। যাহাদের আয় অধিক তাহাদের পক্ষে সঞ্চয় করা সহজ। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ১/১০ অংশ অপেক্ষা অনেক বেশী সঞ্চয় করিতে পারেন। তবে সে অবস্থার লোকের পক্ষেও সঞ্চয় ব্যাপারে অনেক অসুবিধা দেখা যায়। বেশী আয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বেশী ব্যয়ের পথও পরিষ্কার হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় ছাড়া আমোদ-প্রমোদ, আরাম ইত্যাদির জন্য, বিবাহ প্রভৃতি নানা উৎসব উপলক্ষে তাঁহারা এত বেশী ব্যয় করিয়া ফেলেন যে

তাঁহাদের আর সঞ্চয় করা সম্ভবপর হয় না। সেজন্যই অনেক বড় লোকের, জমিদার প্রভৃতিরও বহু ঋণ হয়। এ সকল কারণে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ আয় অনুসারে সঞ্চয় করা প্রয়োজন। তাহা হইলে অনেক সময় ঐ টাকা হইতেই সমস্ত বিপদে উদ্ধার পাওয়া সম্ভবপর হয়।

চেক

পূর্ব্বে লোকেরা সঞ্চিত টাকা কলসীতে পুরিয়া মাটীর নীচে রাখিত। আজকাল সে নিয়ম অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে। এখন প্রায় সকল লোকেই ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে। উহার ফলে টাকা যেমন নিরাপদ থাকে, তেমনই টাকা হইতে কিছু লাভ ও (সুদ) হয়। অনেক লোকই টাকা ঠিক ভাবে খাটাইয়া লাভ করিতে পারে না। তাহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কে টাকা রাখা সুবিধা-জনক। তাছাড়া ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকা আদান প্রদান করিবার পক্ষে খুব সুবিধা।

ব্যাঙ্কে টাকা সাধারণতঃ দুই রকম হিসাবে জমা দেওয়া যায়। প্রথমতঃ চলতি (current) হিসাবে এবং দ্বিতীয়তঃ মেয়াদী বা স্থায়ী (Fixed) হিসাবে। চলতি হিসাবের সুবিধা এই যে সেক্ষেত্রে যখন ইচ্ছা তখনই টাকা উঠান যায়। এইজন্য বড় ব্যবসায়ী, জমিদার বা অন্য যাঁহাদের সকল সময় টাকা আদান-প্রদানের দরকার তাঁহারা চলতি হিসাবে টাকা জমা দেন। মেয়াদী হিসাবের মধ্যে সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে সপ্তাহে একবার টাকা

উঠান যায়। মাসিক, ত্রৈমাসিক বা অন্যান্য হিসাবে টাকা জমা দিলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে টাকা উঠান যায় না। তবে ঐ সকল হিসাবে টাকা জমা দিলে বেশী সুদ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ যাঁহাদের টাকা বেশী আদান-প্রদানের দরকার হয় না এবং নিজেরাও বেশী খাটাইয়া লাভ করিতে পারেন না তাঁহারা এই সকল হিসাবে টাকা জমা দেন।

চলতি, সেভিংস প্রভৃতি হিসাবে টাকা আদান প্রদানের জন্য আজকাল চেকের ব্যবস্থা হইয়াছে। চেক (Cheque) প্রকৃত পক্ষে ব্যাঙ্কের উপর একটি আদেশ। যিনি টাকা জমা রাখেন তিনি ব্যাঙ্ক হইতে একটি পাশ বই (যাহাতে প্রত্যেকটি জমা ও খরচের হিসাব লেখা থাকে) এবং চেক বই পাইয়া থাকেন। টাকা জমা দেওয়ার সময়ই জমাদাতাকে একটি নির্দ্দিষ্ট কাগজে সই (signature) করিয়া দিতে হয় এবং ঠিক ঐরূপ সই করা যে কোন চেক দিলেই যদি জমাদাতা বা জমাদাত্রীর নামে ব্যাঙ্কে টাকা থাকে, তাহা হইলে চেক যাহাকে দেওয়া হইবে তিনি টাকা উঠাইতে পারিবেন ; অথবা নিজেও নিজের প্রয়োজনমত টাকা উঠাইতে পারিবেন। যদি ব্যাঙ্কে চেকের সমান টাকা না থাকে, বা সেভিংস ব্যাঙ্কে এক সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তুলিতে চান, বা সহির অমিল থাকে তাহা হইলে চেকের টাকা দেওয়া হয় না। ইহাকে চেক dishonour করা বলে। তাছাড়া অন্য সকল অবস্থায়ই চেক দিয়া টাকা উঠান যায়।

চেক ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি বিষয় জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

যথা—(১) যিনি চেক দিবেন তাঁহার সই ব্যাঙ্কে যে সই থাকে তাহার সহিত মিলিয়া যাওয়া দরকার। (২) যে পরিমাণ টাকার জন্য চেক দিবেন তাহা ব্যাঙ্কে জমা থাকা চাই। (৩) সেভিংস ব্যাঙ্কে সপ্তাহে একবারের বেশী চেক দিবেন না। (৪) চেকের মধ্যে দুইটি অংশ থাকে—বাম দিকের ছোট অংশ (Counterfoil) ; এবং ডান দিকের বড় অংশ। বাম দিকের ছোট অংশে কাহাকে কোন তারিখে কত টাকা দেওয়া হয় তাহা লিখিয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রয়োজন মত হিসাব মিলাইয়া দেখা যায়। (৫) চেকে টাকার অঙ্ক, তারিখ, যাঁহাকে চেক দেওয়া হয় তাঁহার নাম ইত্যাদি স্পষ্ট করিয়া লেখা প্রয়োজন। (৬) যাঁহাকে চেক দেওয়া হয় তিনি চেকটির পিছন দিকে সই করিয়া (ঠিক যে ভাবে চেকে নাম লেখা আছে সেরূপ বানান করিয়া) টাকা তুলিতে পারেন। সই ভুল হইলে টাকা দেওয়া হয় না।

চেক সাধারণতঃ নিম্নলিখিত প্রকার হয়। (১) বেয়ারার চেক (Bearer Cheque)—এই চেকে যাঁহার নাম লেখা থাকে তিনি অথবা অন্য যে কেহ ব্যাঙ্কে চেক লইয়া গেলেই ব্যাঙ্ক টাকা দিয়া থাকে। এ সকল চেকে "Pay.........or bearer" লেখা থাকে। (২) অর্ডার চেকে (Order Cheque) পূর্ব্বের চেকের বেয়ারার কাটিয়া "Order" লেখা হয়। সুতরাং যাঁহার নামে চেক দেওয়া হয়, তিনি স্বয়ং সই না করিলে টাকা দেওয়া হয় না। কাজেই এই চেক লইয়া তিনি নিজে ব্যাঙ্কে গিয়া

টাকা তুলিতে পারেন, অথবা সই করিবার পর অন্য লোককে টাকা তুলিবার জন্য দিতে পারেন। এ সকল চেকে প্রাপক টাকা পাইলেন বলিয়া প্রমাণ থাকে। (৩) ক্রস্ চেক (Crossed Cheque)—এ সকল চেকে উপরের বামদিকে দুইটি রেখা সমান্তরালভাবে টানিয়া তাহার মধ্যে "& Co." লিখিতে হয়। তাহা হইলে যাঁহাকে টাকা দেওয়া হয় তিনি সই করিয়া যাঁহার ব্যাঙ্কের হিসাব আছে এরূপ লোকের মারফত টাকা ভাঙ্গাইতে পারেন। এরূপ চেকে অন্যের পক্ষে ঠকাইয়া টাকা লওয়ার ভয় থাকে না। কারণ কোনরূপ গোলযোগ হইলেই যাঁহার মারফত টাকা ভাঙ্গান হইয়াছে তাঁহাকে ধরা সম্ভব হয়। যদি কেহ চেক লইয়া নিজে গিয়া বা কোন লোক পাঠাইয়া ব্যাঙ্ক হইতে টাকা আনাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ঐ চেক লইয়া ব্যাঙ্কে গিয়া তাঁহাকে চেকখানি দাখিল করিতে হইবে। চেক দাখিল করিলেই ব্যাঙ্ক হইতে তাঁহাকে একটি চাকৃতি (Token) দেওয়া হয়। ঐ চাকতি লইয়া "Cash"-এর জানালাতে গেলে চাকৃতির নম্বর মিলাইয়া লইয়া টাকা দেওয়া হয়। আর যাঁহারা ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঐ চেক নিজেদের হিসাবে জমা দিতে পারেন। তাহা হইলে ঐ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে আদায় করিয়া জমাদাতার হিসাবে জমা হইবে। পরে দরকার মত তিনি ঐ টাকা উঠাইতে পারিবেন।

পাশ বই

কোন লোক যখনই কোন ব্যাঙ্কে বা পোষ্ট্‌ অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে কোন টাকা জমা রাখে তখনই সেই ব্যাঙ্ক হইতে তাহাকে একখানা পাশ বই দেওয়া হয়। ঐ পাশ বহিতে টাকা জমা দেওয়ার তারিখ ও কত টাকা জমা দেওয়া হইল তাহা লেখা থাকে এবং খাতার পাতার এক পাশে জমা গ্রহণকারী কর্ম্মচারী বা ব্যাঙ্কের ভারপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর থাকে। তাহার পর হইতে যখনই ব্যাঙ্কে ঐ হিসাবে কোন টাকা জমা দেওয়া হয়, তখনই ঐ পাশ বহিতে পূর্ব্বের মত তারিখ ও জমা দেওয়ার টাকার পরিমাণ লিখিয়া মোট কত টাকা হইল তাহা দেখান হয়। তারপর টাকা তুলিবার সময়েও প্রত্যেকবারে কোন তারিখে কত টাকা উঠান হইল তাহা লিখিয়া উঠান টাকার পরিমাণ বাদ দিয়া মোট কত টাকা জমা থাকে তাহা হিসাব করিয়া দেখান থাকে। কাজেই প্রত্যেক লোক নিজ নিজ পাশ বই দেখিয়া যে কোনদিন জানিতে পারেন যে তাঁহার হিসাবে ঐ দিনে মোট কত টাকা জমা আছে। কোন ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়া বা তুলিবার সময় পাশ বই সঙ্গে না লইলেও চলে। সে সকল ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে পাশ বই ব্যাঙ্কে পাঠাইয়া নির্দ্দিষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত (Up-to-date) হিসাব পরিষ্কার করিয়া আনা হয়। তাহা না করিলে আমানতকারীর পক্ষে খুবই অসুবিধা হয়।

পোষ্ট্‌ অফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে কোন তারিখে অধিক টাকা পাঠাইতে হইলে পূর্ব্বে জানাইয়া দিতে (Notice) হয়

তাছাড়া সারা বৎসরে নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী জমা দেওয়া বা উঠানও যায় না। কিন্তু ব্যাঙ্কে বা কো-অপারেটিভ্ সোসাইটীতে ঐ রকম নিয়ম শিথিল করা হয়। আমানতকারিগণের সুবিধার জন্য Home Savings Bank-এর একটি তালাবদ্ধ বাক্স দেওয়া হয়। তাহার উপরের ফাঁক দিয়া বাক্সের মধ্যে যখন যাহা ইচ্ছা রাখিয়া দিলে কিছুদিন পর পর তাহা ব্যাঙ্কে লইয়া চাবি দিয়া খুলিয়া বাক্সের মধ্যে যাহা আছে তাহা হিসাব করিয়া আমানত-কারীর নামের হিসাবে জমা করিয়া তাহাকে পাশ বই দেওয়া হয়। ইহা গরীব লোকেদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক।

জীবন বীমা

আজকাল জীবন বীমার খুব প্রচলন হইয়াছে এবং সেজন্য দেশী ও বিদেশী বহু কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কোম্পানীর মধ্যে দুই শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীকে প্রভিডেন্ট্ কোম্পানী (Provident Company) বলা হয়। ঐ সকল কোম্পানী সাধারণতঃ যাহাদের আয় খুব অল্প তাহাদের জন্য গঠিত। তথায় প্রত্যেক লোক মাসিক ১৲।২৲ জমা দিলে নির্দ্দিষ্ট বৎসর পরে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পায়। এই সকল কোম্পানীতে বীমাকারীর ডাক্তারী পরীক্ষা ইত্যাদি দরকার হয় না। এই সকল কোম্পানীতে নির্দ্দিষ্ট মাস বা বৎসর পরে লোকের মৃত্যু হইলে কত টাকা কোম্পানী দিবে তাহা লেখা থাকে। যে কোন সময়ে মৃত্যু হইলে পূর্ণ টাকা দেওয়া হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার বীমা কোম্পানীকেই প্রকৃত বীমা কোম্পানী বলা হয়। ঐ সকল কোম্পানীর সহিত বীমাকারীর চুক্তি (Policy) হয় যে বীমাকারী প্রত্যেক বৎসর কোম্পানীকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিবে এবং ঐ টাকা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বৎসর ধরিয়া দিবে। তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানী ঐ লোককে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে চুক্তির নির্দ্দিষ্ট মোট টাকা দিবে। যদি ইহার মধ্যে (বীমা করার পর যে কোন সময়ে) বীমাকারীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কোম্পানী ঐ চুক্তির মোট টাকা বীমাকারীর আত্মীয়কে দিবে। তবে এক বৎসরের মধ্যে ঐ লোক আত্মহত্যা করিলে, বা বীমার কোন বিষয়ে জাল বা মিথ্যা প্রমাণিত হইলে চুক্তি (Policy) বাতিল হয় এবং তাহা হইলে আর টাকা দেওয়া হয় না। বীমা করিবার সময় বীমা কোম্পানী বীমাকারীর সম্বন্ধে অনেক খবর জানিয়া থাকে। যথা—তাহার নাম, বয়স, ব্যবসায়, শারীরিক অবস্থা (উচ্চতা, বুকের ছাতি, শরীরের ওজন প্রভৃতি), কোন অসুখ এক বৎসরের মধ্যে হইয়াছে কি না অথবা এ যাবৎ তাহার কি কঠিন রোগ হইয়াছে ইত্যাদি। তাঁহার পিতা-মাতার বয়স, তাঁহারা মৃত হইলে তাঁহাদের মৃত্যুকালীন বয়স ও রোগ, ভাই, ভগ্নী প্রভৃতিরও বয়স ইত্যাদি এই সকল বিষয় জানিয়া বীমা কোম্পানী ঐ লোকের ডাক্তারী পরীক্ষা গ্রহণ করে এবং বীমাকারীর একজন পরিচিত লোকের নিকট হইতেও কিছু কিছু সংবাদ জানিয়া লয়। তারপর ঐ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহার জীবনকে Standard বা Normal Life

অথবা দেশের অবস্থা অনুযায়ী 'আদর্শ' জীবন বলা যায় কি না তাহা স্থির করে। তারপর তাহার জীবন বীমার প্রিমিয়াম স্থির করে। যদি কোন লোকের স্বাস্থ্যের অবস্থা বা অন্যান্য বিবরণ জানিয়া তাহার জীবন standard life বলিয়া বিবেচিত না হয় তাহা হইলে কোম্পানী প্রিমিয়ামের হার বাড়াইয়া দেয়। এমন কি সেক্ষেত্রে বীমা মোটে নাও করিতে দিতে পারে।

সাধারণতঃ যে সকল চুক্তিতে জীবনবীমা করা হয় তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান।

Whole Life Assurance by payment of Premium throughout life—এই চুক্তিতে বীমার হার খুব কম থাকে। বীমাকারী সারা জীবন নির্দ্দিষ্ট হারে (বাৎসরিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক) প্রিমিয়াম দিবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়গণ চুক্তির মোট টাকা পাইবেন। যে কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু হউক না কেন, মোট টাকা সকল সময়ই পাওয়া যাইবে।

Whole life Assurance by limited payment—এই চুক্তিতে বীমার হার একটু বেশী হয়। বীমাকারী নির্দ্দিষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত (১০, ১৫, ২০. ২৫ বৎসর ইত্যাদি) অথবা নির্দ্দিষ্ট বয়স (৪৫, ৫০, ৫৫ ইত্যাদি) পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম দিবে। ঐ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে আর প্রিমিয়াম দিতে হইবে না। এক্ষেত্রে বীমাকারীর মৃত্যু হইলেই আত্মীয়গণ টাকা পাইবে। তিনি মেয়াদের পূর্ব্বে বা পরে যখনই মারা যান না কেন টাকা সমানই পাওয়া যায়।

Endowment Policy-তেও প্রিমিয়াম নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত বা নির্দ্দিষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই দুইপ্রকার পলিসিতে পূর্ব্বের দুইপ্রকার পলিসি অপেক্ষা সুবিধা এই যে, যদি বীমাকারী মেয়াদের পূর্ব্বে মারা যান তাহা হইলে তাঁহার আত্মীয়-গণ টাকা পাইবেন, আর যদি তিনি মেয়াদ পর্য্যন্ত বাঁচেন তাহা হইলে তিনি নিজেই টাকা পাইবেন। Double Endowment Policy করিলে বীমাকারী মেয়াদ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে চুক্তির দ্বিগুণ টাকা পাইবেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি মারা গেলে আর দ্বিগুণ টাকা পাওয়া যায় না।

Educational and Marriage Endowment Policy করিলে যে ছেলে মেয়ের শিক্ষা বা বিবাহের উদ্দেশ্যে বীমা করা হয় সে জীবিত থাকিলে কোম্পানী তাহাকে চুক্তিমত নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট টাকা দিবে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে ঐ ছেলে বা মেয়ের মৃত্যু হইলে, অতি সামান্য পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু যদি বীমাকারী পূর্ব্বেই মারা যান, তাহা হইলে ছেলেমেয়ের শিক্ষা বা বিবাহ যে উদ্দেশ্যে বীমা করা হইয়াছে সে উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট টাকা পাওয়া যায়।

Joint Life Policy করিলে স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে যে কেহ পূর্ব্বে মারা গেলে অপরজন টাকা পাইয়া থাকেন।

এ সকল বীমা ছাড়া Aviation Policy, Marine Policy, Fire Policy প্রভৃতি বিভিন্ন বিপজ্জনক বিভাগে চাকুরিয়াগণের জন্য বিভিন্ন প্রকার বীমার ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া যাঁহারা নাটক

অভিনয়, নাচ প্রভৃতি দর্শাইয়া জীবিকা উপার্জ্জন করেন, তাঁহাদের হাত পায়ের আঙ্গুল প্রভৃতি অঙ্গবিশেষের জন্য বীমা করারও ব্যবস্থা আছে। আবার বাড়ী-ঘরের জন্য Fire Insurance প্রভৃতি নানাপ্রকার বীমার ব্যবস্থা আছে।

প্রিমিয়াম

যে সকল লোকের আয় কম অথচ পরিজনের নিকট জীবনের মূল্য বেশী তাঁহাদের পক্ষে জীবন বীমা করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ ইচ্ছা থাকিলেও বেশী টাকা জমাইতে পারেন না। অথচ তাঁহাদের পরিজন-বর্গের জন্য ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। এরূপ লোকের সুবিধার জন্য অল্প প্রিমিয়ামে বীমা করার প্রথা প্রচলিত হয়। কাজেই অনেক ক্ষেত্রে বীমা জোরপূর্ব্বক সঞ্চয়ের উপায় (Forced Saving) স্বরূপ হইয়া থাকে। এই প্রিমিয়ামের টাকা বীমাকারীর সুবিধা অনুযায়ী বাৎসরিক, যাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা কোন কোন ক্ষেত্রে মাসিক হইতে পারে। তবে বাৎসরিক প্রিমিয়ামের হার অন্য হার অপেক্ষা একটু কম। প্রত্যেক প্রিমিয়াম দেওয়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট তারিখের (Due date) পরেও সময়-বিশেষে ১৫ দিন হইতে ১ মাস বেশী সময় (Period of grace) দেওয়া হয়। ঐ সময়ের মধ্যে প্রিমিয়ামের টাকা জমা না দিলে জরিমানা বাবদ কিছু সুদ (Interest) আদায় করা হয়।

সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমান, বীমা করা ভিন্ন অন্যান্য উপায়েও

অর্থ সঞ্চয় করা যায়। কোম্পানীর কাগজ ও নানাপ্রকার শেয়ার কিনিয়া অনেক লোক অর্থ-সঞ্চয় করিয়া থাকে। ঐ সকল টাকা যথেষ্ট নিরাপদ এবং তাহাতে বেশ লাভও হয়। ঐ সকল কাগজ বা শেয়ার বাজারে বিক্রয় হয়। যখন কোন কাগজের মূল্য বেশী হয় তখন তাহা লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক দামে (at a premium) বিক্রয় হয়, আর যখন তাহার দাম কমিয়া যায় তখন লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম দামে (at a discount) বিক্রয় হয়।

পারিবারিক আয়-বৃদ্ধি

ইউরোপীয়গণের মধ্যে এমন কি এদেশীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই চাকুরী করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন। আমাদের দেশীয় লোকেদের মধ্যেও কোন কোন পরিবারের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। ইহা ছাড়া সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা সাক্ষাৎভাবে অর্থ উপার্জ্জন করেন না। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে এবং একটু কষ্ট করিলেই কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিয়া পরিবারের আয় বাড়াইতে এবং নিজেদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারেন। শহর এবং গ্রাম সকল স্থানেই এভাবে আয় বাড়ান সম্ভবপর। তবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা দরকার। পাড়াগাঁয়ে প্রত্যেক বাড়ীতে ঘরের পাশে, পুকুর-ধারে যে সকল খালি জায়গা থাকে তথায় নানাপ্রকার তরকারী, লঙ্কা, পেঁপে প্রভৃতির গাছ রোপণ করা যাইতে পারে

যে সকল বাড়ীতে চাউল কেনা হয়, তথায় ধান কিনিয়া নিজেরা ধান ভানিয়া লইতে পারেন। চাউল হইতে চিঁড়া, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারেন। স্ত্রীলোকেরা ইচ্ছা করিলেই বাড়ীতে হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন করিতে পারেন। তাহাতে ডিম খাওয়ার সুবিধা হয় এবং কিছু আয়ও বাড়ে। আরও একটু বেশী কষ্ট করিলে গরু, ছাগল প্রভৃতিও পালন করা যায়। এভাবে গ্রামের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরাই চেষ্টা করিয়া কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আয়-বৃদ্ধি করিতে পারেন।

কুটীর-শিল্প

স্ত্রীলোকগণের পক্ষে বিভিন্ন উপায়ে পারিবারিক আয়-বৃদ্ধির পক্ষে কুটীর-শিল্পই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এদেশে নানাপ্রকার কাঁচা মাল পাওয়া যায়, অথচ তাহাদিগকে শিল্প-দ্রব্যে পরিণত করার উপায় নাই। সেজন্যই এদেশের লোকেরা শিল্পনিপুণতায় অন্য দেশ অপেক্ষা হীন। কিন্তু এদেশে কুটীর-শিল্পের যে সুবিধা আছে তাহা অনেক দেশে নাই। এদেশে কার্পাস প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাহা হইতে চরকা, তকলী প্রভৃতি দ্বারা সুতা কাটিয়া সেই সুতা দিয়া তাঁতে কাপড় বুনা একটি প্রধান কুটীর-শিল্প। শহরে ও গ্রামে প্রায় প্রত্যেক পরিবারেই সুতা কাটা চলিতে পারে। তারপর সেই সুতার সাহায্যে তাঁতী দ্বারা কাপড় বুনান যায়। পাট এদেশের বহু স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। তাহা দিয়া দড়ি, থলে, সিকা প্রভৃতি মেয়েরা অনায়াসে তৈয়ার করিতে

পারেন। রেশমের সূতা দ্বারা, রঙ্গীন সূতা দ্বারা নানা-প্রকার শেলাই (Embroidery) সূচীকার্য্য প্রভৃতি করিয়া অনেক স্ত্রীলোকেই বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন। পশম দ্বারা নানা-প্রকার গরম জামা, মাফলার, মোজা প্রভৃতি তৈয়ার করা যায়। এ



কয়েকটি কুটীর-শিল্পজাত দ্রব্য ১। চরকায় সূতা-কাটা ২। মাটির হাঁড়ি কলসী নির্ম্মাণ ৩। এমব্রডিয়ারীর কাজ

সকল একটু সূক্ষ্ম কাজ বাদ দিলে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের পক্ষেও,ধান ভানা, মুড়ি, চিঁড়া প্রভৃতি তৈয়ার করা, মাটীর হাঁড়ি কলসী প্রভৃতি ও পুতুল তৈয়ার করা ইত্যাদি নানা উপায়ে পারিবারিক আয়-বৃদ্ধির সুযোগ আছে। তারপর যাঁহারা একটু বেশী শিক্ষিত ও অধিক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা

ঘরে বসিয়া নানা-রকম সাবান, কালী প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারেন ; ঝুড়ি, মাছুর, পাটী প্রভৃতি তৈয়ার করিতে পারেন ; কড়ি, ঝিনুক প্রভৃতির বাক্স, আমসত্ব, নানা প্রকার আচার, আসন, টেবিল-ক্লথ, রুমাল প্রভৃতি কত কি যে তৈয়ার করিয়া প্রয়োজন মত বিক্রয় করিয়া পারিবারিক আয়-বৃদ্ধি করিতে পারেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক পরিবার এই সকল উপায়ে জীবিকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

এসকল কাজ মোটেই হীন কর্ম্ম নহে ; অথচ ইহাদের দ্বারা মোটামুটি ভাল আয় হয় এবং তাহার ফলে পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে। অনেক ক্ষেত্রে দুঃস্থ বিধবাগণ ঐ সকল কাজ করিয়া নিজেদের পরিবার পর্য্যন্ত পালন করিতে পারেন। প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই ঐরূপ কোন না কোন কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে নিতান্ত বিপদের সময়েও তিনি পরের বোঝা হইয়া থাকিবেন না এবং সকল সময়েই পরিবারকে নিজের ক্ষমতা অনুসারে সাহায্য করিতেও পারিবেন।

প্রশ্ন

Describe in detail the methods you may adopt to keep your house not only clean, but in good order and to improve your finance by some home-industries. (C. U.—1942).

2. Draw up a domestic budget for a family of six members (two adult males, two adult females and two children of school-going age) with a monthly income of Rs. 150. (C. U.—1943).
3. State the advantages of Life Insurance over other forms of investment in the case of middle class families. (C. U.—1943).
4. State the advantages of the Post Office Savings Bank. (C. U.—1944).
5. State the advantages of Life Annuities. (C. U. —1944).
6. Give rules for the management of money for household expenditure. (C. U.—1944).

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য

স্বাস্থ্যই সম্পদ। সুতরাং প্রত্যেক লোকেরই নিজ নিজ স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য যত্ন করা উচিত। প্রত্যেক লোক একটু চেষ্টা করিলেই পরিবারের, সমাজের ও দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভাল হইবে। তাহার ফলে দেশের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার।

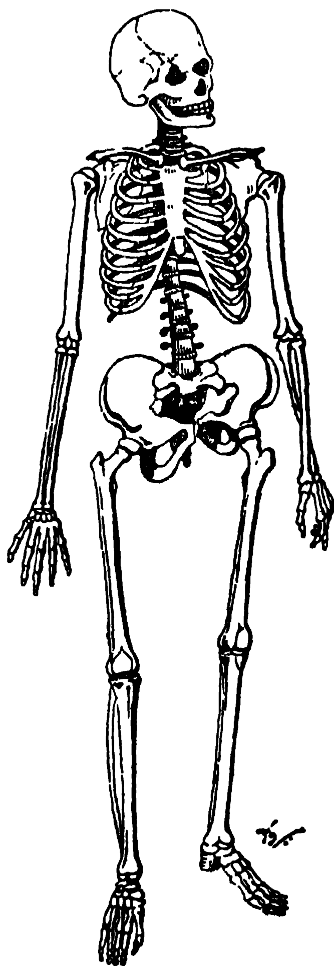
(ক) মানবদেহের সাধারণ বিবরণ

মানব দেহ সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—কঠিন অংশ—যেমন অস্থি, দাঁত, নখ প্রভৃতি; কোমল অংশ—মাংস-পেশী, শিরা, উপশিরা, ধমনী প্রভৃতি; অন্যান্য যন্ত্রমণ্ডল, রক্তপ্রবাহী যন্ত্রমণ্ডল প্রভৃতি।

কঠিন অংশ

নর কঙ্কাল—মানবদেহের কঠিন অংশের মধ্যে অস্থিসমূহ সর্ব্ব-প্রধান। মানুষের শরীরে প্রথমতঃ অস্থিসমূহ দ্বারা তৈয়ারী একটি কাঠাম (frame-work) আছে। ঐ কাঠামকে নরকঙ্কাল

Skeleton বলে। এই নরকঙ্কাল আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, ও বক্ষ-পঞ্জরাদি ঊর্দ্ধ প্রত্যঙ্গ, বক্ষ-প্রদেশ ও নিম্ন-প্রত্যঙ্গ। সকল অঙ্গের অস্থির মোট সংখ্যা প্রায় ২০০। ইহাদের আকৃতি, আয়তন প্রভৃতি নানা-প্রকার। যথা—মাথার অস্থি-সমূহ চ্যাপ্টা এবং ধারগুলি করাতের মত খাঁজ-কাটা, হাত ও পায়ের অস্থিগুলি লম্বা এবং কোন কোন অংশ গোলাকার, হাঁটুর অস্থি বাটীর মত ইত্যাদি। মেরুদণ্ডের অস্থিগুলির মধ্য দিয়া স্নায়ু চলিয়া গিয়া উহা-দিগকে মালার ন্যায় গাঁথিয়া রাখি-য়াছে। বিভিন্ন প্রকার অস্থি এরূপ হওয়ার ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠন এত বিচিত্র। অস্থি ব্যতীত আমাদের শরীরের ৩২টি দাঁত, প্রত্যেক আঙ্গুলে নখ প্রভৃতিও আছে।



নরকঙ্কাল

কোমল অংশ

মাংস-পেশী—অস্থি-সমূহের উপরিভাগে যে কোমল জিনিষসমূহ থাকে তাহাদিগকে মাংসপেশী বলে। উহাদের উপরে ত্বক্ বা চর্ম্ম থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশী-সমূহের আকৃতি ও কার্য্য বিভিন্ন প্রকার। মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন মাংসপেশীসমূহ কোমল থাকে, মৃত্যুর পরে উহারা কঠিন হয়। মানুষের মানুষপেশী সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। উহাদের সাহায্যেই আমরা খাওয়া, চলা-ফরা, লেখা-পড়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক কাজ করিতে পারি। মাংসপেশী ভিন্ন, আমাদের শরীরে অসংখ্য ধমনী, শিরা, উপশিরা আছে। উহাদের মধ্য দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হয়।

অন্যান্য যন্ত্রমণ্ডল

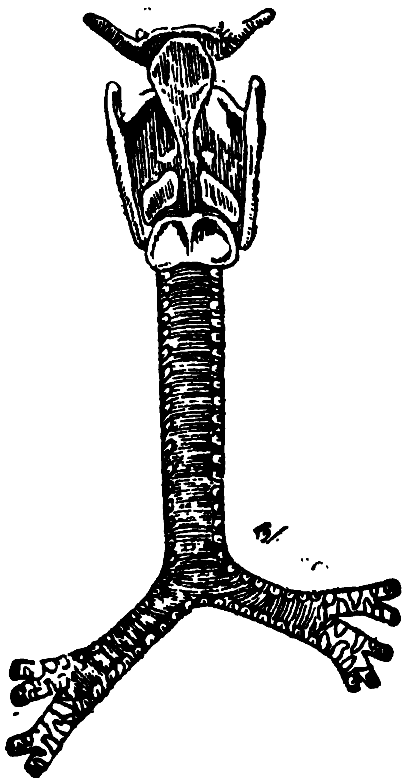
রক্তপ্রবাহী যন্ত্রমণ্ডল—আমাদের শরীরের পুষ্টিসাধন, বিভিন্ন অংশের ক্ষয়পূরণ এবং দূষিত পদার্থসমূহকে শোধন ও শরীর হইতে অপ্রয়োজনীয় জিনিষসমূহ বাহির করিয়া দেওয়া প্রভৃতি সকল কাজে রক্তই প্রধান উপাদান। রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ লাল। উহা একটি তরল পদার্থ বলিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ধমনী, শিরা, উপশিরা প্রভৃতির মধ্য দিয়া সহজে প্রবাহিত হইয়া থাকে। এই রক্তের মধ্যে শ্বেত-কণিকা, লোহিত-কণিকা ও অন্য একটি তরল পদার্থ থাকে।

রক্ত-প্রবাহের জন্য আমাদের শরীরের বক্ষপঞ্জরের মধ্যে বুকের বাম পার্শ্বে একটি হৃৎপিণ্ড থাকে। ইহাই রক্তপ্রবাহের প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ। এই হৃৎপিণ্ড একটি ফাঁপা যন্ত্র। ইহা বক্ষদেশের নিম্নসীমায় অবস্থিত 'ডায়াফ্রাম' নামক পাতলা পর্দ্দার মত একটি মাংস-পেশীর উপর অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে চারিটি ছোট কুঠরী আছে। উহাদের দুইটি বাম পার্শ্বে ও দুইটি ডান পার্শ্বে অবস্থিত। উহাদের একটি উপরে ও একটি নীচে আছে। উপর ও নীচের কুঠরী দুইটির মধ্যে রক্ত চলাচলের পথ আছে। কিন্তু বাম পার্শ্বের কুঠরী হইতে ডান পার্শ্বের কুঠরীতে রক্ত চলাচলের কোন উপায় নাই। উপরের কুঠরী দুইটি এক সঙ্গে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। সেইরূপ নীচের দুইটিও এক সঙ্গে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হয়। ইহার ফলে উপরের কুঠরী হইতে একই সময়ে নীচের কুঠরীতে রক্ত প্রবাহিত হয়। উপরের কুঠরী দুইটিকে ভেন্ট্রিকল বলে। বামদিকের ভেন্ট্রিকল হইতে একটী প্রকাণ্ড ধমনী (Aorta) বহির্গত হইয়াছে। উহা হইতে আবার অসংখ্য প্রশাখা (Arteries) বাহির হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া গিয়াছে। এদিকে ডান দিকের অরিকল হইতেও একটি প্রকাণ্ড শিরা (Vein) বাহির হইয়া একটু পরেই দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে (Superior and Inferior Vana cava) এবং তাহা হইতে অসংখ্য উপশিরা বাহির হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। ধমনীর প্রশাখা ও উপশিরা-সমূহের শেষ প্রান্ত আবার জালের মত হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে।

হৃৎপিণ্ডের কুঠরী-সমূহ অনবরত সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতেছে। ইহার ফলে বাম দিকের ভেণ্ট্রিকল হইতে বিশুদ্ধ রক্ত প্রথমে প্রধান ধমনীতে যায়, তারপর অন্যান্য শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া শরীরের সর্ব্বত্র প্রবাহিত হয়। এভাবে প্রবাহিত হওয়ার সময় নানা প্রকার দূষিত জিনিষের সংস্পর্শে রক্ত দূষিত হয় ও উহার রঙ্ বিবর্ণ হয়। তারপর বিভিন্ন স্থান হইতে দূষিত রক্ত আবার উপশিরা সমূহের মধ্য দিয়া আসিয়া প্রধান শিরায় পৌঁছে। তথা হইতে সমস্ত দূষিত রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসে এবং সেখানে হইতে উহা ফুসফুসে যায়। ফুসফুসে প্রশ্বাস বায়ুর সহিত মিশ্রিত অম্লজান বাষ্পের সংস্পর্শে ঐ দূষিত রক্ত বিশোধিত হয়। ঐ বিশুদ্ধ রক্ত পুনরায় হৃৎপিণ্ডে আসে এবং পূর্ব্বের নিয়মে সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়।

শ্বাসযন্ত্র মণ্ডল—শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কিত বিবিধ যন্ত্রের মধ্যে ফুসফুস প্রধান। আমাদের শরীরে দুইটি ফুসফুস আছে এবং উহারা বক্ষপঞ্জরের মধ্যে বুকের দুই পার্শ্বে অবস্থিত। বাম দিকের ফুসফুসে দুই ভাগ এবং ডান দিকের ফুসফুসে তিন ভাগ আছে। ফুসফুস ছাড়া নাসাপথ, শ্বাসনল প্রভৃতি কতকগুলি নল শ্বাসযন্ত্রের বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ। আমরা যে প্রশ্বাস-বায়ু গ্রহণ করি, তাহা নাসিকার মধ্য দিয়া ফেরিংক্স, ট্রেকিয়া, প্রভৃতি নলের মধ্য দিয়া ফুসফুসে আসে, তথায় বায়ুর মধ্যস্থিত অম্লজান বাষ্পের সংস্পর্শে দূষিত রক্ত বিশোধিত হয়। তারপর ঐ অম্লজান বিশুদ্ধ রক্তের সহিত সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়

এবং ইহা দূষিত-উপাদান-সমূহের সংস্পর্শে দূষিত হয়। তাহার ফলে উহা, কার্ব্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয় এবং নিঃশ্বাস বায়ু-রূপে উহা শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে। এভাবে ফুসফুসে বায়ু-প্রবাহের জন্য ডায়াফ্রামের সাহায্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ডায়াফ্রাম স্বতঃই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং উহার চাপেই ফুসফুসে বায়ু-প্রবাহের ব্যবস্থা হইয়া থাকে



শ্বাসযন্ত্র

পরিপাক যন্ত্রমণ্ডল—পরিপাক কার্য্যের জন্য দাঁত, জিহ্বা, পাকস্থলী, যকৃৎ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। আমাদের মুখে দুই পাটী দাঁত আছে। সকল

প্রকার খাদ্যদ্রব্যকে আমরা দাঁত দিয়া চিবাইয়া নরম করিয়া ফেলি। তারপর জিহ্বার দ্বারা উহাদের স্বাদ গ্রহণ করি এবং



জিহ্বা চিবান খাদ্যকে মুখের মধ্যে মিশাইয়া উহাকে খাদ্যনালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীর দিকে ঠেলিয়া দেয়। খাদ্যদ্রব্য প্রত্যেক অবস্থাতেই নানাপ্রকার লালা ও অন্যান্য তরল পদার্থের সহিত মিশিয়া নীচের দিকে নামিয়া পাকস্থলীতে আসিয়া সঞ্চিত হয়। তথায় চারিদিক হইতে প্রচুর রস আসে এবং খাদ্য হজম হয়। এই পাকস্থলীটি দেখিতে কতক পরিমাণে ইংরাজী 'V'-এর মত। তথা হইতে ভুক্তদ্রব্যসমূহ ক্ষুদ্র অন্ত্রের মধ্য দিয়া নীচের দিকে আসিবার সময়েও হজম কার্য্যের সাহায্য হয়। তাহার পর উহার সারাংশ রক্তের মধ্য দিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রবাহিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ মল-মূত্ররূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া আসে। খাদ্যদ্রব্য হজম করিবার জন্য যকৃৎ প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থি বিশেষভাবে সাহায্য করে।



পরিপাক-যন্ত্র

স্নায়ুমণ্ডল—স্নায়ুমণ্ডলীর কেন্দ্র মস্তিষ্ক। তথা হইতে স্নায়ুসমূহের এক প্রধান শাখা মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া মেরু-রজ্জুরূপে বিস্তৃত হইয়াছে। শরীরের কোন অংশে কোন প্রকার উত্তেজনা হইলে বা কোন প্রকার কার্য্য করিবার উপক্রম হইলে স্নায়ুসমূহ হইতে সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ মস্তিষ্কে গিয়া পৌঁছে এবং তথাকার আদেশ অনুযায়ী অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের কার্য্য হইয়া থাকে। এরূপ বিভিন্ন কার্য্য এত তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় যে, তাহাতে মস্তিষ্কের ইঙ্গিত বা আদেশের বিষয় সাধারণ বুদ্ধিতে বিশ্বাস করা কষ্টকর হয়।

মল-নিঃসারণ যন্ত্রমণ্ডল—মল, মূত্র, ঘর্ম্ম প্রভৃতির সহিত আমাদের শরীর হইতে দূষিত পদার্থসমূহ বাহির হইয়া যায়। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইটি কিড্নি (kidnies) থাকে। রক্ত হইতে দূষিত অংশ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রস্রাবে পরিণত করা কিড্নির প্রধান কাজ।

কিড্নি হইতে মূত্র-নলের মধ্য দিয়া আমাদের শরীরের দূষিত তরলাংশের খানিকটা নির্গত হয়। শরীরের অপর কতকগুলি দূষিত পদার্থ নিঃসরণের জন্য চর্ম্ম সাহায্য করে। চর্ম্মের মধ্যস্থিত ঘর্ম্মগ্রন্থির মধ্যে শরীরের দূষিত পদার্থ সঞ্চিত হয় এবং চর্ম্মের লোমকূপের মধ্য দিয়া উহা বাহিরে আসে। মলের বিষয় পরিপাক যন্ত্রমণ্ডলে লিখিত হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়সমূহ—(ক) চক্ষুর সাহায্যে আমরা সকল জিনিষ দেখিতে পাই। চক্ষুর মধ্যে কর্ণিয়া, লেন্স প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ আছে। কোন জিনিষ চক্ষুর সামনে পড়িবামাত্র তাহার আলো কর্ণিয়া,

লেন্স প্রভৃতির মধ্য দিয়া আসিয়া সকলের পশ্চাৎদিকে অবস্থিত রেটিনাতে পড়ে। তখন স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্ক হইতে ইঙ্গিত পাইলেই আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

(খ) কর্ণের সাহায্যে আমরা শুনিতে পাই। কর্ণের মধ্যে তিনটি ভাগ থাকে। কোন শব্দ হইবামাত্র তাহা বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়া গিয়া শেষ অংশে অবস্থিত যন্ত্রসমূহে পৌঁছে। তখন স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের ইঙ্গিত পাইলেই আমরা শব্দ শুনিয়া থাকি।

(গ) নাসিকার সাহায্যে আমরা ঘ্রাণ লই। কোন জিনিষের গন্ধ বায়ুর সাহায্যে নাসিকাতে পৌঁছিলে, স্নায়ুর সাহায্যে মস্তিষ্কের ইঙ্গিত পাইবার পর আমরা তাহার ঘ্রাণ পাই।

(ঘ) জিহ্বার সাহায্যে আমরা স্বাদ অনুভব করি। জিহ্বাতে অসংখ্য ফুসকুড়ি আছে। বিভিন্ন অংশের ফুসকুড়ির সাহায্যে আমরা বিভিন্ন স্বাদ (পশ্চাৎভাগের সাহায্যে তিক্ত, পার্শ্বের সাহায্যে লবণ, মিষ্ট প্রভৃতি) পাইয়া থাকি।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস

আমাদের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য চলে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি মিনিটে ১৬ হইতে ১৮ বার এই কাজ হয়। অধিক পরিশ্রমের সময়ে, দৌড়াদৌড়ি করিলে ইহার সংখ্যা বাড়ে ; আবার গভীর চিন্তা করিবার সময় একটু কমে। সাধারণতঃ নাসিকার মধ্য দিয়া আমরা প্রশ্বাস বায়ু গ্রহণ করি

ও নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করি। নাসিকার প্রবেশ-পথে অনেক চুল থাকার ফলে বায়ু প্রবেশের সময় তাহার মধ্যস্থিত ধূলা-বালি প্রভৃতি ঐ সকল চুলে বাধা পায় বলিয়া বিশুদ্ধ বায়ুই ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ নাসিকার মধ্যে বায়ু প্রবেশের পথটি খুব ঘুরান, কাজেই বায়ু প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটু উত্তপ্ত ও সিক্ত হয়। ইহার ফলে নাসিকার মধ্য দিয়া যে বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করি তাহাতে আমাদের সহজে সর্দ্দিকাশি হয় না। কিন্তু যে সকল লোকের টন্‌সিল ও এডিনয়েড্ গ্ল্যাণ্ড্ বড় তাহারা মুখের মধ্য দিয়া প্রশ্বাস গ্রহণ করে। তাহার ফলে তাহাদের মুখের মধ্য দিয়া সহজেই বায়ুর সহিত ধূলাবালি প্রবেশ করিতে পারে। ইহারা প্রায়ই সর্দ্দিকাশি প্রভৃতিতে ভুগিয়া থাকে। তাছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথেরিয়া, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি রোগের জীবাণু প্রশ্বাসের সহিত কাহারও শরীরে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করিলে ঐ সকল রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে। সেজন্য প্রত্যেক লোকেরই যত অধিক সম্ভব বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা উচিত। ঐ উদ্দেশ্যে যত সময় খোলা মাঠে বা ঘরের বাহিরে উন্মুক্ত স্থানে থাকা যায় ততই ভাল। তাছাড়া প্রত্যেক লোকেরই খুব ভোরে কিছুক্ষণ গভীর ভাবে শ্বাস গ্রহণ (deep breathing) করা উচিত। যে সকল লোক কাজকর্ম্ম উপলক্ষে বা অন্য বিশেষ কারণে বেশী দিন জন-বহুল ঘরে, কারখানায় থাকিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের পক্ষে যখনই সুবিধা ঘরের বাহিরে আসা উচিত। সেইরূপ যাঁহারা জনবহুল

নগরে বাস করেন তাঁহাদেরও সুযোগ পাইলেই শহরের বাহিরে যাওয়া উচিত। দিনের বেলা ঘরের বাহিরে থাকা এবং সময় সময় ঘরের দরজা জানালা খোলা রাখা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের বিশেষ সহায়ক। রাত্রিতে ঘুমের সময়েও যাহাতে ঐ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্যে বাধা না হয় তাহাও দেখা উচিত। সেজন্য কখনও নাক মুখ ঢাকিয়া ঘুমাইবে না এবং বুকে হাত রাখিবে না। কখন কখন বুকে হাত চাপা পড়িয়া নিঃশ্বাস আট্‌কাইয়া যাইতে চায় এবং সেরূপ অবস্থায় ঘুমের ঘোরে লোকে নানারূপ অস্পষ্ট শব্দ করিয়া থাকে, ভয় পাইয়া থাকে।

ব্যায়াম

আমরা যে সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি তাহা ভাল ভাবে হজম করিবার জন্য এবং আমাদের শরীরের ও মনের স্বাস্থ্য, স্ফূর্ত্তি ও সৌন্দর্য্য লাভের জন্য নিয়মিতভাবে পরিশ্রম করা দরকার। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পরিশ্রম করার জন্য ব্যায়ামই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে আমাদের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বেশী হয়। ফলে প্রশ্বাসের সহিত অধিক অম্লজান বাষ্প গ্রহণ করার সুযোগ ঘটে এবং তাহাতে রক্ত অধিক বিশোধিত হয় এবং বিশুদ্ধ রক্ত অধিক পরিমাণে দেহমধ্যে সঞ্চালিত হয়। তাছাড়া উহাতে অধিক ঘাম হয়। এসকল কারণে একদিকে আমাদের শরীরের দূষিত

পদার্থ অধিক পরিমাণে বাহিরে আসে, অন্যদিকে বিশুদ্ধ পদার্থ অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে ও সঞ্চালিত হয়। নিয়মিত ভাবে উপযুক্ত ব্যায়ামের ফলে শরীরের সকল অংশেরই উন্নতি হয়। ইহাতে মাংসপেশী দৃঢ় হয়, শরীরের শক্তিবৃদ্ধি হয়, অঙ্গসৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, স্নায়ুমণ্ডলী অধিকতর সক্রিয় হয়, দেহের দূষিত জিনিষ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। মোটের উপর ব্যায়ামের ফলে শরীরের সকল বিষয়েই বিশেষ উন্নতি হয়। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেরই নিজ নিজ বয়স ও স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ব্যায়াম করা উচিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন কোন অবস্থায় ব্যায়াম করা অনিষ্টকর, তাছাড়া তাহাদের ব্যায়াম এমন হওয়া উচিত নহে যাহাতে কমনীয়তা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে প্রাতর্ভ্রমণ, সান্ধ্যভ্রমণ প্রভৃতি প্রকৃষ্টতম ব্যায়াম। বিদ্যালয়ের বালিকারা দড়ির সাহায্যে স্কিপিং করিয়া, দৌড়াদৌড়ি করিয়া, ড্রিল করিয়া ব্যাড্‌মিণ্টন, বস্কেট্‌বল প্রভৃতি খেলিয়া ব্যায়াম করিতে পারে। ইহাতে বয়স অল্প থাকিতে থাকিতেই তাহাদের স্বাস্থ্য সুন্দররূপে গঠিত হইয়া উঠিতে পারে এবং বড় হইলে শুধু প্রাতর্ভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণের দ্বারাই তাহারা স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে পারে। মেয়েদের পক্ষে নিয়মিত কিন্তু পুরুষদের চেয়ে কম ব্যায়াম করা উচিত।

ছেলেমেয়েরা যখন খুব ছোট থাকে তখন তাহাদের পক্ষে বেশী ব্যায়াম করা বা লেখাপড়ার জন্য বেশী চাপ দেওয়া উচিত নহে।

কারণ অতিরিক্ত চাপ যেদিক হইতেই দেওয়া হয় তাহাতে তাহাদের শরীরের ক্ষতি হয়। বয়স্ক লোকদেরও নানাপ্রকার চিন্তা ও শারীরিক পরিশ্রম অধিক করিতে হয়। কাজেই তাহাদেরও কঠোর ব্যায়াম করা উচিত নহে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন বয়সের স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে বিভিন্নরূপ ব্যায়াম করা উচিত। সাধারণ হিসাবে ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত আপন মনে খেলাধূলা এবং বয়স্ক লোকের পক্ষে ভ্রমণই স্বাস্থ্য-রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত। তাহার অতিরিক্ত ব্যায়াম তাহাদের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে।

ব্যায়াম সম্বন্ধে অন্য কতগুলি নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য। যথা—স্ত্রী পুরুষ কাহারও শরীর যখন অসুস্থ থাকে, অথবা কোন রোগভোগের অল্পকাল পরে ব্যায়াম করা উচিত নহে। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও নিয়মিতভাবে ব্যায়াম করিবে। ব্যায়াম করিবার সময়ের ও পরিমাণের পরিবর্ত্তন স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নহে। খালিপেটে বা গুরুভোজনের পর বা পূর্ব্বে ব্যায়াম করা উচিত নহে। সকাল বা বিকাল বেলা সামান্য জলযোগের পর ব্যায়াম করিবে। উন্মুক্ত স্থানে ব্যায়াম করা উচিত এবং ব্যায়াম করিবার সময় ঢিলা পোষাক ব্যবহার করিবে। ব্যায়াম করিবার জন্য কোন প্রকার যন্ত্র ব্যবহার না করিলেও কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু অধিক যন্ত্র ব্যবহার সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বিশেষ সতর্ক হইতে হয়। উহার ফল কখন কখন খারাপ হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ব্যায়ামও অনেক সময় স্বাস্থ্যের পক্ষে

বিশেষ অনিষ্টকর। উহাতে কেবল যে দেহের কঠোরতা বাড়ে বা সৌন্দর্য্য হষ্ট নয় তাহা নহে, উহার ফলে নানাপ্রকার রোগেরও সৃষ্টি হয়।

বিশ্রাম

নিয়মিত পরিশ্রম বা ব্যায়াম যেরূপ শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী, নিয়মিত বিশ্রামও সেরূপ শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। অধিক পরিশ্রম করিলে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্লান্ত হয়, মন অবসন্ন হয়, স্নায়ু দুর্ব্বল হয় এবং রক্ত দূষিত হয়। সুতরাং পরিশ্রমের পরে বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক।

বিশ্রাম বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। কোন একপ্রকার কাজ করিতে করিতে উহা ছাড়িয়া অন্য আর কোনও কাজ করাও একপ্রকার বিশ্রাম। কঠোর পরিশ্রমের পর আমোদ প্রমোদ বা সামান্য কিছুকাল বেড়ানও বিশ্রাম। বিশ্রামের জন্য ঘুমও একান্ত দরকার। সুতরাং কিরকম পরিশ্রম করা হইয়াছে তাহা জানিয়া তাহার উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হয়। অল্প পরিশ্রমের পর আমোদ প্রমোদই উপযুক্ত বিশ্রাম বলিয়া গণ্য। উহার ফলে মনের স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসে এবং যে অল্প সময় শরীর বিশ্রাম পায় তাহাতেই তাহা আবার নূতন কাজের উপযুক্ত হয়।

কিন্তু কঠোর পরিশ্রমের পরে শুধুমাত্র আমোদ প্রমোদই যথেষ্ট নহে। কঠোর পরিশ্রম করিবার জন্য প্রত্যেক লোককে কিছুক্ষণ

পর পরই কিছুকালের জন্য বিশ্রাম করিতে হয়। নতুবা শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। মাঝে মাঝে অল্প বিশ্রাম করিলেও শরীর কিছুক্ষণের মধ্যে আবার একটু সতেজ হইতে পারে। কিন্তু অধিককাল পরিশ্রম করিবার পর আর অল্প বিশ্রাম করিলে চলে না। সেজন্যই ফ্যাক্টরী প্রভৃতিতে আইন করিয়া কঠোর পরিশ্রমের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ ফ্যাক্টরীতে ৮ ঘণ্টার বেশী কাহাকেও কাজ করিতে দেওয়া হয় না। কঠোর পরিশ্রমের পরে একটু বেশী বিশ্রাম লওয়া দরকার। তখন বিশ্রাম না লইয়া কাজ করিতে গেলে কাজ কিছুতেই ভাল হয় না। অথচ জোর করিয়া বেশী কাজ করিতে গেলে শরীর এতই অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, তাহার পরে সুস্থ হইতে যথেষ্ট সময় লাগে। এমন কি দীর্ঘদিন এভাবে চলিবার ফলে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। কাজেই এরূপভাবে অধিক পরিশ্রম করা কখনই স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নহে। সেজন্যই স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে অল্প পরিশ্রান্ত হইলেই কিছুকাল বিশ্রাম করা উচিত।

সকল প্রকার বিশ্রামের মধ্যে নিদ্রাই শ্রেষ্ঠ। সমস্তদিন কঠোর পরিশ্রমের পর রাত্রে গাঢ় ঘুম হইলে, সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হয় এবং শরীর সম্পুর্ণ সুস্থ হয়। ফলে পরদিন আবার কঠোর পরিশ্রম করিতে কোনও কষ্ট হয় না। কিন্তু রাত্রে সুনিদ্রা না হইলে পরদিন কাজ করা কষ্টকর হয়। এবং এভাবে কিছুদিন চলিলে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুস্থ ব্যক্তির পরিশ্রমের পর ঘুম যেমন দরকার রুগ্ন ব্যক্তির সুস্থ

হওয়ার পক্ষে ঘুম তাহা অপেক্ষা কম দরকারী নহে। কঠোর পরিশ্রম-ক্লান্ত ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় ঔষধ অপেক্ষাও সুনিদ্রায় বেশী উপকার হয়। সেজন্য রোগী ঘুমাইয়া থাকিলে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া ঔষধ দেওয়া ঠিক নহে। সাধারণতঃ শিশুগণের ঘুম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং বয়স্ক লোকের ঘুম কম হয়। গাঢ় নিদ্রা সকল অবস্থাতেই সুস্থতার লক্ষণ, কারণ শরীর সুস্থ না থাকিলে কাহারও সুনিদ্রা হয় না।

ঘুম সম্বন্ধে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালন করা দরকার। যুবকগণের পক্ষে দিবানিদ্রা অনিষ্টকর। সুস্থ শরীরে কাহারও দিনের বেলা ঘুমান উচিত নহে। তবে সকলের পক্ষেই দিনে আহারের পরে কিছুকাল বিশ্রাম করা দরকার। দিনে ২।৩ ঘণ্টা বিছানায় শুইয়া থাকা চলিতে পারে, কিন্তু ঐ সময়ে ঘুমান উচিত নহে। আহারের পরে ঐরূপ বিশ্রাম করিলে হজমের পক্ষে সুবিধা হয় এবং তাহার পরে লোক অধিক পরিশ্রম করিতে পারে। অথচ দিনে খাওয়ার পর বিশ্রাম না করিয়া তখনই কাজে লাগিলে হজমের ব্যাঘাত হয় এবং ভরাপেটে কাজ করিতেও যথেষ্ট অসুবিধা হয়। বৃদ্ধদের পক্ষে কিছুকাল দিনের বেলা ঘুমান ভাল। শিশুদের পক্ষে উহা স্বাভাবিক এবং অনেক সুস্থ শিশুই পেট ভরিয়া খাইলেই ঘুমাইয়া পড়ে। রাত্রিতে ঘুমাইবার নিয়ম সম্পূর্ণ পৃথক্। রাত্রিতে সকলেরই আহারের পর কিছুকাল চলাফেরা করিয়া বা গল্প করিয়া তারপরে ঘুমান উচিত। খাওয়ার অন্ততঃ আধ ঘণ্টার মধ্যে

কিছুতেই ঘুমান উচিত নহে, ২।৩ ঘণ্টা পরে ঘুমাইলেই ভাল। তবে রাত্রিতে খাওয়ার পরে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পড়াশুনা না করাই উচিত। উহা করিলে ভাল ঘুম হয় না এবং হজমেরও ব্যাঘাত হয়।

ঘুমাইবার সময় হাত পা লম্বা করিয়া শুইবে। কখনও কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইবে না, বা নাক মুখ ঢাকিয়া শুইবে না। শয়নের সময় প্রথমে কিছুক্ষণ বাম কাৎ হইয়া শয়ন করিবে, কিন্তু কখনও উপুড় বা চিৎ হইয়া শয়ন করিবে না। বিছানা যেন খুব নরম বা খুব শক্ত না হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। তাছাড়া বিছানা যেন উপযুক্ত পরিমাণ লম্বা হয় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। অনেক সময়ই দেখা যায় যে বয়স্ক লোক ও ছেলেমেয়েরা একই বিছানায় ঘুমাইয়া থাকে। কিন্তু তাহা উচিত নহে প্রত্যেকের পৃথক এবং দেহের মাপ অনুসারে বিছানা হওয়া উচিত। বিছানা ঘরের এমন জায়গায় হইবে যে সেখানে যেন প্রচুর বাতাস পাওয়া যায়। সেজন্য দেওয়ালের পাশে বা ঘরের কোণে শয়ন করা উচিত নহে। শয়ন ঘরে যাহাতে প্রচুর বাতাস পাওয়া যায় সেজন্য জানালাগুলি খুলিয়া রাখিবে। তবে বৃষ্টির ছাট ঘরে গেলে ঘরের জানালা বন্ধ রাখা যাইতে পারে। শয়ন-গৃহে কখনও আগুন রাখিবে না। কোন কোন লোক শীতকালে ঘরে আগুন জ্বালিয়া রাখে। ঐরূপ ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। শয়ন-কালে মশারি অবশ্যই

টানাইবে, নতুবা মশা, আরশুলা প্রভৃতি ঘুমের ব্যাঘাত করিতে পারে। তাছাড়া মশার কামড়ের ফলে ম্যালেরিয়া জ্বরও হইতে পারে। ঘুমের পূর্ব্বে হাত পা ধোয়া এবং ঠাণ্ডা জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।

বিভিন্ন বয়সের লোকের পক্ষে বিভিন্ন পরিমাণ ঘুম আবশ্যক।

শিশু—

সদ্যোজাত	প্রায় ২৪ ঘণ্টা
১ মাস বয়স	২১ ঘণ্টা
৬ মাস "	১৮ "
১ বৎসর "	১৫ "
৪ বৎসর "	১৩ "

পুরুষ—

৬ বৎসর বয়স	১২ ঘণ্টা
৮।১৩ " "	১০^{১} "
১৫ " "	১০ "
১৭ " "	৯½ "
পূর্ণ বয়স্ক	৮ "
বৃদ্ধ	৮।৯ "

স্ত্রীলোক—

৬ বৎসর	১২ ঘণ্টা
৮-১১ বৎসর	১০½ ঘণ্টা
১২-১৭ "	১০।১১ ঘণ্টা
পূর্ণ বয়স্কা	৯ ঘণ্টা
বৃদ্ধা	৮।৯ ঘণ্টা

পরিচ্ছন্নতা

শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য নিম্নলিখিতরূপ কাজ করা উচিত।

স্নান—স্নান করিলে পা হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গই পরিষ্কার হয়। সেজন্য সুস্থ শরীরে সকলেরই স্নান করা উচিত। স্নান করিলে গায়ে যে ময়লা থাকে তাহা উঠিয়া যায়। উহাতে শীত সহ্য করিবার ক্ষমতা বাড়ে এবং শরীর স্নিগ্ধ হয়। উহার ফলে স্নায়ুমণ্ডল সতেজ হয়। শরীর ও মনে আনন্দ ও পবিত্রতার ভাব জাগিয়া থাকে। স্নানের ফলে শরীরের অধিক রক্ত সঞ্চালন হয়। তাছাড়া নদীতে বা পুকুরে সাঁতার কাটিয়া স্নান করিলে উত্তম ব্যায়াম হয়। এসকল নানা কারণে সুস্থ অবস্থায় নিত্য স্নান করা কর্ত্তব্য। কোন কোন লোক প্রতিদিন তিনবার পর্য্যন্ত স্নান করেন। গরমের সময় ঐরূপ স্নান যেমন উপকারী, তেমনই আরামদায়ক। আবার ইউরোপ প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে গরম জলে স্নান খুব আরামদায়ক। রোগীর পক্ষেও সময়ে সময়ে স্নান খুব উপকারী। সকল রোগীরই মাথা শীতল জলে উত্তমরূপে ধুইয়া দিতে হয় এবং অবস্থা বিশেষে গরম বা শীতল জলে গা মুছিয়া (sponge) দিতে হয়। ইহা খুবই আরামদায়ক এবং উপকারী। কোন কোন রোগীকে বরফ জল দিয়া গা মুছাইয়া দেওয়া হয়।

স্নান সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম পালন করা উচিত। যথা—

স্নানের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। খুব ভোরে অথবা মধ্যাহ্নে আহারের পূর্ব্বে স্নান করিবে। নদীতে স্নান সর্ব্বাপেক্ষা ভাল, অন্ততঃ পক্ষে বড় পুকুর বা দীঘিতে স্নান করা উচিত। স্নানের পূর্ব্বে ভাল করিয়া সমস্ত শরীরে তৈল মালিশ করিবে। তারপর ভাল তোয়ালে বা গামছা দ্বারা ঘসিয়া ঐ তৈল ও তাহার সহিত শরীরের সমস্ত ময়লা তুলিয়া ফেলিবে। রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বা শিশুদের পক্ষে রৌদ্রে উত্তপ্ত বা ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করা উচিত। স্নানের পরে ভাল চিরুণি দিয়া চুল আঁচড়ান উচিত। স্নান করিবার জন্য শীতল জল ব্যবহার করাই ভাল। স্নান করার সময়ে অনেক লোক একসঙ্গে পুকুরে নামিয়া জল ঘোলা করা উচিত নহে, বা জিদ করিয়া বেশী সাঁতার কাটা উচিত নহে। উহার ফলে শরীরের অনিষ্ট হয়। মোটকথা, স্নান স্বাস্থ্যরক্ষার একটী প্রধান উপায়। ইহা মনে রাখিয়া নিয়মিত সময়ে স্নান করিবে।

স্নানের সময় অনেকেই সাবান ব্যবহার করে। কাহারও কাহারও এরূপ ধারণা আছে যে, প্রতিদিন সাবান ব্যবহার করিলে চুলকণা হয় না, এবং শরীর পরিষ্কার হয় ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ঐ ভাবে সাবান ব্যবহারের ফলে উপকার অপেক্ষা অপকার বেশী হয়। মাঝে মাঝে সাবান ব্যবহার করিলে তৈল-যুক্ত ময়লা উঠিয়া যায় সত্য, কিন্তু অধিক সাবান ব্যবহার করিলে চর্ম্মের কোমল অংশ কঠোর হয়। তাছাড়া খারাপ সাবান, অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করিলে নানা

প্রকার খোস ইত্যাদি হইবার ভয়ও বেশী থাকে। সুতরাং প্রতিদিন সাবান ব্যবহার না করিয়া মাঝে মাঝে (সপ্তাহে দুইবার) ভাল সাবান ব্যবহার করা উচিত। হাত পায়ের ময়লা তুলিবার জন্য মাঝে মাঝে সাবান ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শরীরের বিভিন্ন অংশের পরিচ্ছন্নতা

স্বাস্থ্যরক্ষার উদ্দেশ্যে শরীরের প্রত্যেক অংশের যত্ন লওয়া দরকার, কারণ যে কোন একটি অঙ্গের রোগ হইলেই সমস্ত শরীরে অসুস্থতা বোধ হয়। সুতরাং শরীরের প্রত্যেক অংশের যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা দরকার।

মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্য্যন্ত সকল অংশ সম্বন্ধেই নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

মাথার চুল—মাথার চুল যাহাতে ঘন ও বড় হয় সেজন্য চুলের গোড়ায় বেশ ভাল করিয়া ঘসিয়া তৈল মাখিতে হয়। উহার ফলে মাথার মরামাসও উঠিয়া যায়। মাথায় মোটেই তৈল না দেওয়া যেমন খারাপ অতিরিক্ত তৈল দেওয়াও তেমনই খারাপ। অতিরিক্ত তৈল দিলে চুলে জট হয় এবং মাথাও গরম হয়। স্নান করিবার পর মাথার চুল বুরুশ বা চিরুণি দিয়া ভাল করিয়া আঁচড়াইবে। যদি কোনও কারণে উকুন হয় তাহা হইলে সাবান দিয়া মাথা ধুইবে এবং ভাল করিয়া বার বার আঁচড়াইয়া উকুন মারিয়া ফেলিবে। মাথা পরিষ্কার থাকিলে আর উকুন হইবার ভয় থাকে না।

চক্ষু—আমাদের চক্ষু না থাকিলে জীবনই বৃথা। সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে চক্ষুর যত্ন লইবে। আমাদের সকল কাজেই চক্ষুর দরকার। তবে লেখাপড়া, ছবি আঁকা, সূচের কাজ প্রভৃতিতে চক্ষুর যত বেশী পরিশ্রম হয় অন্যান্য কাজে তত হয় না। সেজন্য দিবাভাগে চক্ষুর পরিশ্রম বেশী হইলেও রাত্রিতে যাহাতে চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তাছাড়া বৈদ্যুতিক আলো, অন্য কোন প্রকার অধিক আলোতে অথবা খুব কম আলোতে কাজ করিলে, কিংবা ফ্যাসনের জন্য চশমা ব্যবহার করিলে চক্ষুর অনিষ্ট হয়। খুব ছোট অক্ষরে লেখা বই পড়িলে, খুব চক্‌চকে কোন জিনিযের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, সিনেমা প্রভৃতি অধিক দেখিলেও চক্ষুর অনিষ্ট হয়। মাঝে মাঝে চক্ষু ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলিলে, খোলা মাঠ, নীল আকাশ, দূরবর্ত্তী সাগর, পাহাড়-পর্ব্বত প্রভৃতির দিকে তাকাইলে অথবা মাঝে মাঝে চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলে চক্ষুর বিশ্রাম হয়। কোন সময়ে চক্ষুর অসুস্থতা হইলে সঙ্গে সঙ্গে কিছুকাল সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিবে এবং ঔষধ ব্যবহার করিবে। রাস্তার ধূলাবালি বা প্রখর আলো হইতে চক্ষুকে রক্ষা করিবার জন্য Eye-preserver বা gogles ব্যবহার করা ভাল। মাঝে মাঝে গোলাপ জল প্রভৃতি দ্বারা চোখ মুছিয়া ফেলাও ভাল।

কর্ণ—কর্ণের সহিত মুখ, চক্ষু, গলা প্রভৃতি অংশের যোগাযোগ রহিয়াছে। সেজন্য কর্ণপীড়া অর্থাৎ কানে পুঁয প্রভৃতি হইলে মুখ, চক্ষু ও গলার রোগ হওয়ার ভয় থাকে। তাছাড়া

কর্ণে ময়লা জমিলে বা পুঁয হইলে স্পষ্ট শুনিবার পক্ষেও বিঘ্ন হয়। এই সকল কারণে সর্ব্বদা কর্ণ পরিষ্কার রাখা উচিত। কর্ণে মাঝে মাঝে তৈল দেওয়া ভাল এবং বেশী ময়লা জমিলে গ্লিসারিণ বা হাইড্রোজেন প্যারঅক্সাইড ব্যবহার করা যাইতে পারে।

নাসিকা—নাসিকা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্যের প্রধান অঙ্গ। কাজেই নাকে শ্লেষ্মা বা অন্য ময়লা জমিয়া থাকিলে বা অতিরিক্ত নস্য দিলে ঐ কার্য্যের পক্ষে বাধা হয়। সর্দ্দি হইলে নাক সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা একান্ত দরকার। অন্য সময়েও নাকে যাহাতে কোন প্রকার ময়লা জমিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। মাঝে মাঝে নাসাপান এবং নিয়মিত ভাবে deep-breathing কেবল নাসিকার পক্ষে নহে, সমস্ত শরীরের পক্ষে উপকারী।

জিহ্বা—জিহ্বার সাহায্যে আমরা সকল খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করি। জিহ্বাতে ময়লা জমিলে স্বাদ বুঝা যায় না। জিহ্বার উপরে সাধারণতঃ যে ময়লা পড়ে তাহা মুখ ধুইলেই বা আঙ্গুল দ্বারা ঘসিলেই উঠিয়া যায়। কিন্তু পেটের গোলমালের জন্যই সাধারণতঃ জিহ্বা ময়লা হয়। সুতরাং পেট সুস্থ না হইলে জিহ্বার ময়লাও সম্পূর্ণ দূর হয় না। প্রত্যহ মুখ ধুইবার সময় জিহ্বা পরিষ্কার করা উচিত। কিন্তু জিহ্বা বেশী জোরে ঘসিয়া ক্ষত করা উচিত নহে।

দাঁত—সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য চিবাইয়া খাওয়ার জন্য দাঁতের

দরকার। দাঁত ভাল না থাকিলে (নড়িলে, ভাঙ্গিয়া গেলে, পোকা হইলে বা গোড়ায় ক্ষত হইলে) শক্ত খাদ্য খাওয়া যায় না এবং অন্য খাদ্য খাওয়ার সময় পূঁয, নানা প্রকার ময়লা প্রভৃতিও পেটের মধ্যে গিয়া নানা প্রকার রোগের সৃষ্টি করে। সাধারণতঃ দাঁত লোকের অসাবধানতার জন্য নষ্ট হয়। প্রত্যেকবার খাইবার সময় কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া থাকে। উহা পরিষ্কার না করিলে খাদ্যের কণা তথায় জমিয়া থাকে। দীর্ঘকাল এইরূপে খাদ্যের কণা দাঁতের ফাঁকে জমিয়া থাকার ফলে ঐ সকল ময়লা তথায় পচিয়া দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হয়, পূঁয হয়, দাঁতের উপরের এনামেল উঠিয়া যায় এবং দাঁত নড়ে। এ সকল কারণে দাঁত দুর্ব্বল হয় এবং অকালে পড়িয়া যায়। কিন্তু প্রতিদিন সকালে ও রাত্রে ঘুমাইবার পূর্ব্বে ভাল তাজা নিমের ডাল বা অন্যান্য দাঁতন, কোনরূপ টুথ-পাউডার, টুথ-পেষ্ট্ বা টুথ-ব্রাস দ্বারা দাঁত মাজিলে দাঁতে ময়লা জমিতে পারে না। টুথ-ব্রাস, টুথ-পেষ্ট্ প্রভৃতি ব্যবহার করা সত্ত্বেও কখন কখন দাঁতের গোড়ায় গোড়ায় অথবা টুথ ব্রাসের গোড়ায় ময়লা আটকাইয়া থাকে। এই বিষয়ে সাবধান থাকা দরকার।

দাঁত শক্ত রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে শক্ত জিনিষ চিবান ভাল। দাঁতের গোড়াতে রক্ত চলাচলের সাহায্য করিবার জন্য মাড়ি ভাল ভাবে ঘসিয়া দেওয়া উচিত। এরূপ ভাবে যত্ন লইলে দাঁত ভাল থাকে এবং তাহার ফলে মুখের সৌন্দর্য্য, খাওয়ার আরাম এবং স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

ত্বক্‌‐ চর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে বা লোমকূপে ঘর্ম্ম, নানা প্রকার ময়লা ও তৈলাক্ত জিনিষ জমিয়া গেলে রং ময়লা দেখায়। তাছাড়া খোস, পাঁচড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার চর্ম্ম রোগ হয়। সেজন্য সর্ব্বদা চর্ম্ম পরিষ্কার রাখিবে। ঐ উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে সাবান ব্যবহার করা ভাল।

নখ—আমাদের হাত এবং পায়ের আঙ্গুলে নখ আছে। আমাদের অভ্যাস ও অলসতার জন্য অনেক সময় আমরা নখ দিয়া ঘামাচি চুলকাই, গা চুলকাই, খোস পাঁচড়া প্রভৃতি চুলকাই এবং দাঁত দিয়া নখ কাটার অভ্যাস করিয়া থাকি। ঐ সকল কারণে নখের নীচে ময়লা জমে ও উহা পেটে যায়। তাহার ফলে আমাদের নানা প্রকার রোগ হয়। নখ (পা বা হাতের) কখনও বড় হইতে দেওয়া উচিত নহে।

পরিচ্ছদ

অধিক শীত বা উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য, কীটের দংশন হইতে রক্ষা পাওয়ার নিমিত্ত বা দেহের উপর ময়লা যাহাতে জমিতে না পারে তাহার জন্য এবং সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য আমরা নানাপ্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করি। আমরা নানা প্রকার জিনিষ দিয়া পোষাক তৈয়ার করি। কার্পাস, শণ প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ এবং রেশম, পশম (ছাগ, মেষ প্রভৃতির লোম হইতে উৎপন্ন) এবং পক্ষীর পালক, পশুর চর্ম্ম প্রভৃতি প্রাণীজ পদার্থ দ্বারা মানুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার পোষাক

তৈয়ার করিয়া থাকে। এই সকল পোষাক ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে উহাদের উপকারিতা ও উপযোগিতা জানা দরকার। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যাহাতে শরীর হইতে সহজে তাপ বাহির হইতে পারে, আবার শীতপ্রধান দেশে যাহাতে দেহে তাপ বৃদ্ধির সাহায্য হয় সেরূপ পোষাক ব্যবহার করা উচিত। বিভিন্ন ঋতুতেও সেজন্য বিভিন্ন প্রকার পোষাক পরিধান করা দরকার। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূতার এবং শীতপ্রধান দেশে পশমের পোষাক ব্যবহার করা উচিত। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গরমের সময় রেশমের জামা প্রভৃতি ব্যবহার করিলে খুব আরাম হয়। তবে উহা তৈয়ার করিতে খরচ বেশী বলিয়া অনেকের পক্ষেই উহা ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় না। পোষাক ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখা দরকার। পোষাক মসৃণ না হইলে উহা চর্ম্মকে উগ্র করিয়া তুলে ও তাহাতে শরীর খসখস করে ও বেশী গরম হয়। বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার পোষাক পরিধান করা উচিত। অধিক সময় আঁটা পোষাক ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। উহাতে রক্ত চলাচলের বাধা হয়, অধিক ঘাম হয় ইত্যাদি। পোষাক যথা-সম্ভব হালকা হওয়া ভাল। পোষাকে ময়লা জমিলেই যাহাতে উহা ধরা পড়ে ও যাহাতে উহা ধুইয়া পরিষ্কার করা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। কখনও ভিজা পোষাক পরিধান করিবে না। ভিজা কাপড় গায়ে শুকান স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব খারাপ।

জুতা—গায়ে জামা-কাপড় পরা এবং পায়ে জুতা পরা—

উভয়েরই উদ্দেশ্য একরূপ। পল্লীগ্রামে অনেক লোক জুতা পরে না, কিন্তু শহরে জুতা প্রায় সকলেই পরিধান করে। শহরের লোকের আর্থিক অবস্থা একটু ভাল, বা জুতা পরা ফ্যাসন বলিয়াই জুতা পরা হয় না। শহরে জুতা না পরিলে অনেক সময়েই নানা প্রকার অসুবিধা বা রোগ হইয়া থাকে। জুতা পরিবার সময়ে একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান না হইলে ভয়ানক অসুবিধা হয়। জুতা যাহাতে কখনও পায়ে ঢিলা বা বেশী আঁট না হয় তাহাই লক্ষ্য করা দরকার। আঁট জুতা পরিধান করিলে পায়ের আকৃতি নষ্ট হয় এবং পা দুর্ব্বল হয়। চীনদেশে মেয়েদের ছোট জুতা পরিধান করিয়া পা ছোট করার রীতি আছে। ছোট পা তথায় সৌন্দর্য্যের পরিচায়ক, কিন্তু উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে বা দ্রুত চলাফেরার পক্ষে অসুবিধাজনক।

বিছানা—ঘুমের আরাম এবং অতিরিক্ত শীত বা উত্তাপ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেক লোকের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু প্রভৃতি অনুসারে বিছানার ব্যবস্থা করা উচিত। গরমের দেশে যেরূপ বিছানাতে শয়ন করা উচিত, শীতপ্রধান দেশে তাহা অপেক্ষা অনেক গরম বিছানা দরকার। বিছানা খুব পরিষ্কার থাকিবে এবং মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিবে। বিছানাতে মশারি ব্যবহার করা একান্ত দরকার এবং কখনও এক বিছানাতে বেশী লোক ঘুমাইবে না। এক ঘরে অধিক বিছানা থাকিলে ঘরে বায়ু চলাচলের অসুবিধা ঘটে এবং স্বাস্থ্য খারাপ হয়। বিছানার জন্য খাট, তক্তপোষ প্রভৃতি ব্যবহার করিলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা

পাওয়া যায়। যাহাতে বিছানাতে ছারপোকা না জন্মিতে পারে বা অন্য কোনরূপ পোকা বা ময়লা না থাকে তাহা লক্ষ্য করা দরকার। পরিষ্কার বিছানায় শয়ন করিলে মন ভাল থাকে এবং আরামে ঘুম হয়। বিছানা বেশী শক্ত বা বেশী নরম হওয়া ভাল নহে। যাহাতে শান্তিতে ঘুমান যায় সেরূপ বিছানাই ভাল।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

অনেক লোক চলাফেরা করা, বসা, শয়ন করা প্রভৃতি বিষয়ে এতই অমনোযোগী যে তাঁহারা বিভিন্ন অবস্থায় সঠিক অবস্থান (exact position) সম্বন্ধে কিছুমাত্র লক্ষ্য করেন না। কোন কোন লোক আবার ইচ্ছা করিয়া (কতকটা ফ্যাসন করিয়া) বাঁকা হইয়া দাঁড়ান, বসেন বা চলেন। ঐরূপ অভ্যাস অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিভিন্ন অবস্থাতে যাহাতে মেরুদণ্ড সোজা থাকে তাহা লক্ষ্য করা দরকার। তাহা না হইলে ক্রমে ক্রমে মেরুদণ্ডের এমন অবস্থা হইবে যে আর চেষ্টা করিলেও সোজা হইয়া কোন কাজ করা চলিবে না। তাছাড়া উহার ফলে শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে বা অনেক কাজেই জোর পাওয়া যাইবে না।

কোন কোন লোক মুখ দিয়া নিঃশ্বাস ফেলে। উহাও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। ঐরূপ করার ফলে সর্দ্দিকাশী হওয়ার ভয় থাকে, টন্‌সিল বড় হয় এবং অন্যান্য প্রকারে শারীরিক কষ্ট হয়।

কোন কোন লোক খুব আঁটিয়া কাপড় পরে। উহাতে শরীরের গঠন বিকৃত হয় এবং ক্রমশঃ শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বিছানা, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ে কোন কোন লোক এতই উদাসীন থাকেন যে, তাঁহারা যে কোন লোকের বিছানায় শয়ন করা, যে কোন লোকের কাপড় জামা ব্যবহার করা, বা যে কোন লোকের সহিত একত্র বা কোন লোকের খাওয়ার পর তাহার থালায় খাইয়া থাকেন। শেষের অভ্যাসটি মেয়েদের মধ্যে এবং প্রথম দুইটি ছাত্রদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকটিই অত্যন্ত অনিষ্টকর। - প্রথম ব্যক্তির যদি কোন রোগ থাকে তাহা হইলে তাহার সহিত একই পাত্রে আহার করিলে অথবা তাহার আহারের পর তাহার পাত্রে আহার করিলে সেই ব্যক্তির রোগ সহজেই অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়।

উপরিলিখিত বিষয় ভিন্ন অনেক লোকের নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ করা, দাঁতমাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি বিষয়ে উদাসীনতা দেখা যায়। উহার ফলে কখন কখন অতিশয় কঠিন রোগও হইয়া থাকে। মোটের উপর প্রত্যেক লোকেরই নিজ নিজ স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উহাই জাতির ও দেশের উন্নতির প্রধান সোপান।

প্রশ্ন

1. Mention a few habits which promote good sleep. (C. U.—1943).
2. Write what you know about the uses of clothing. (C. U.—1944).

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোগ সংক্রমণ ও নিবারণ

রোগ

আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ যখন এক তালে কাজ করিয়া যায় এবং প্রত্যেক অংশেরই যখন সমভাবে উন্নতি হয় তখনই আমরা সুস্থ থাকি। বাস্তবিক পক্ষে সুস্থ অবস্থায় শরীরের বিভিন্ন অংশের অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না। এরূপ অবস্থার ব্যতিক্রম হওয়াকেই আমরা অসুস্থতা বলি। অসুস্থ অবস্থাতেই আমরা কোন অংশে ব্যথা, ফুলা বা অধিক উত্তাপ ইত্যাদি ভাব অনুভব করি।

আমাদের শরীরে যখন এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থা হয়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, কোন রোগের আক্রমণ হইয়াছে।

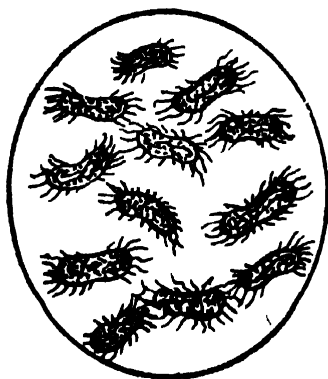
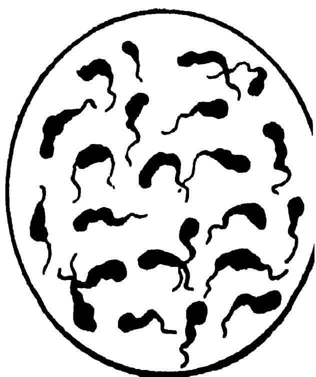
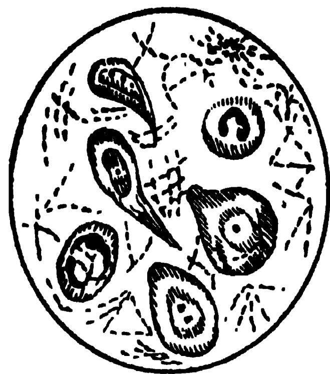
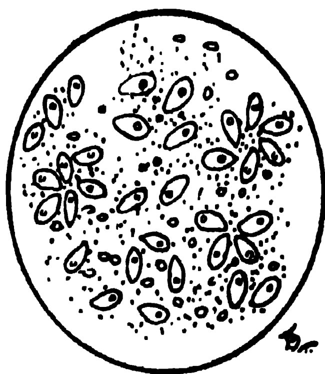
রোগ জীবাণু

বিভিন্ন রোগের কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে বিভিন্ন রোগ উৎপাদনের পূর্ব্বে আমাদের শরীরে কতগুলি জীবাণু প্রবেশ করে। ঐ সকল জীবাণুর সংখ্যা অধিক হইলেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিভিন্ন রোগের জীবাণু দেখিতে বিভিন্ন প্রকার। উহারা এত ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না;

অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে সেগুলিকে দেখা যায়। তাহাদিগকে Microscopic germs বলে। আর কতগুলি এতই ছোট যে ঐ যন্ত্রের সাহায্যেও উহাদিগকে দেখা যায় না। তাহাদিগকে ultra-microscopic virus বলে। বিভিন্ন প্রকার জীবাণুর মধ্যে কতকগুলি জীবজন্তুর দেহ হইতে উৎপন্ন; তাহাদিগকে জৈব বলে। আর কতকগুলি উদ্ভিদ্ হইতে উৎপন্ন; তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলে। সকল প্রকার জীবাণুরই বাঁচিবার জন্য খাদ্য, বায়ু, জল, উত্তাপ প্রভৃতি দরকার। উহারা বায়ুশূন্য স্থানে (vacuum), অধিক উত্তাপ বা রৌদ্রে, শীত ও শুষ্ক স্থানে বাঁচিতে পারে না। উহারা সাধারণতঃ রোগীর দেহের মল, মূত্র, কফ, প্রভৃতির মধ্যে থাকে। তথা হইতে উহারা বাহির হইয়া বায়ু, জল, অন্য নানা-প্রকার তরল পদার্থ প্রভৃতির মধ্য দিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে।

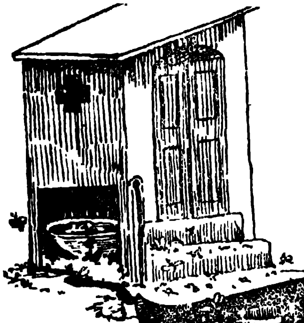
রোগ সংক্রমণ

রোগীর দেহ হইতে রোগ-জীবাণু নানাভাবে বাহিরে আসে এবং নানা উপায়ে সুস্থ লোকের শরীরে প্রবেশ করে। ক্ষয়কাস, ডিপথেরিয়া, সর্দ্দিকাশী, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগের জীবাণু রোগীর মুখ হইতে থুথু, কাশী, গয়ার প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাহিরে আসে। তথায় উহারা শুকাইয়া ধূলাবালির সহিত মিশে এবং বাতাসের সঙ্গে উড়িয়া সুস্থ লোকের নাক-মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করে। কলেরা, টাইফয়েড্ প্রভৃতি নানা রোগের জীবাণু

রোগজীবাণু

মলের সহিত বাহিরে আসে এবং জল বা অন্য তরল পদার্থের সহিত মিশিয়া খাদ্য দ্রব্যের সহিত সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে। আবার কোন কোন সময় রোগজীবাণু শরীরের কোন অংশ কাটিয়া গেলে তথায় রক্তের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রক্তের ভিতর দিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে। এই উপায়েই ধনুষ্টঙ্কার রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্লেগ, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া প্রভৃতি কতকগুলি রোগের জীবাণু - মশা, ইন্দুর প্রভৃতির দ্বারা রুগ্ন ব্যক্তির শরীর হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ লাভ করে। ঐ সকল প্রাণী রোগীর শরীর হইতে রোগের জীবাণু টানিয়া নিজেদের শরীরে আনে এবং সুস্থ লোককে দংশন করিয়া উহা তাহাদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এমন কি গৃহপালিত কুকুর প্রভৃতি প্রাণী







মাছি কত উপায়ে খাদ্যদ্রব্য দূষিত করে

দ্বারাও (উহারা উন্মত্ত হইলে) জলাতঙ্ক প্রভৃতি রোগের জীবাণু সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ লাভ করে। মাছি, পিপীলিকা, আরশুলা প্রভৃতি নিরীহ প্রাণীও বহু প্রকার রোগের জীবাণু বহন করে। মাছি রুগ্ন ব্যক্তির মল-মূত্র প্রভৃতিতে বসে। ফলে রোগের জীবাণু উহাদের গায়ে পায়ে ও পালকে লাগিয়া থাকে। তারপর ঐ জীবাণু লইয়া গিয়া সুস্থ ব্যক্তির পানীয় ও খাদ্যে বসে। এইভাবে রোগের জীবাণু বিস্তৃত হয়।

রোগ-নিবারণ

রোগ নিবারণের প্রধান উপায় রোগজীবাণু নষ্ট করা। যে কোন উপায়ে রোগের জীবাণু-সমূহকে নষ্ট করিতে পারিলেই আর রোগ-বিস্তারের কোন ভয় থাকে না। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে রোগের জীবাণু-সমূহকে ধ্বংস করা হয়।

প্রাকৃতিক শক্তিদ্বারা

সূর্য্যকিরণ—প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের মধ্যে সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। রোগীর মল, মূত্র, থুথু প্রভৃতির মধ্য দিয়া যে জীবাণু বাহিরে আসে তাহাদের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িলে উহাদের কতক অংশ মরিয়া যায়। সূর্য্যকিরণ খুব তীব্র হইলে রোগ জীবাণু-সমূহের মধ্যে অধিকাংশই ধ্বংস হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা তীব্র না হইলে জীবাণুর অতি সামান্যমাত্রই মরিয়া থাকে, তবে ক্ষীণ সূর্য্যালোকের প্রভাবে উহারা একটু ক্ষীণ

হয়। আবার রৌদ্রের তেজ কমিয়া গেলে উহারা সবল হইয়া থাকে।

বায়ু—বায়ুদ্বারা রোগ-জীবাণু ধ্বংস হয় না। তবে বায়ু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে রোগ-জীবাণু উড়াইয়া লইয়া যায়। বায়ু-প্রবাহের ফলে যে স্থানে পূর্ব্বে অধিক জীবাণু ছিল, হয়ত পরে সেস্থানে জীবাণু অনেক কম থাকিবে। কিন্তু অন্য যে জায়গাতে পূর্ব্বে জীবাণু ছিল না সেই জায়গাতে অনেক নূতন জীবাণু পাওয়া যাইবে। তবে বায়ু যদি জীবাণুসমূহকে উড়াইয়া অগ্নিতে ফেলে তাহা হইলে উহাদের ধ্বংস হয়। অথবা নদী, খাল ইত্যাদিতে গিয়া পড়িলে ও উহারা স্রোতের টানে ভাসিয়া যাইতে পারে।

বৃষ্টি—বৃষ্টি দ্বারাও জীবাণু ধ্বংস হয় না। তবে উহার ফলেও জীবাণুসমূহ এক স্থান হইতে অন্যত্র জলের সহিত প্রবাহিত হয়। ঐ জীবাণু যখন কোন খাল, নদী বা সাগরাদিতে গিয়া পড়ে তখন মাছ, অন্য জলচর প্রাণী প্রভৃতি দ্বারা উহাদের কিছু ধ্বংস হয়।

অগ্নি—অগ্নিদ্বারা জীবাণু খুব ভালরূপেই ধ্বংস করা হয়। রোগ জীবাণু ধ্বংসের ব্যাপারে সূর্য্যকিরণ অপেক্ষাও অগ্নিদ্বারা অধিক উপকার হইয়া থাকে। রোগের জীবাণু যে সকল জিনিষে থাকে সে সকল পোড়াইয়া ফেলিতে পারিলে জীবাণুসমূহ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া থাকে। সেজন্য জীবাণু-ধ্বংসের পক্ষে ইহা একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়।

উত্তাপ—অগ্নিতে না পোড়াইয়া অন্য উপায়েও প্রচুর উত্তাপ দিতে পারিলে রোগ-জীবাণু নষ্ট হয়। রোগ-জীবাণু অনেক সময় রোগীর ব্যবহৃত জামা, কাপড়, বিছানা প্রভৃতিতে লাগিয়া থাকে। ঐ সকল জিনিষ সকল সময় পোড়াইয়া ফেলা সম্ভবপর নহে। (অবশ্য ঐগুলি পোড়াইয়া ফেলা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে)। ঐরূপ অবস্থায় উহাদিগকে একটু সোডা দিয়া গরম জলে খুব ভালরূপে ফুটাইলেও জীবাণু মরিয়া থাকে। যে সকল জিনিষকে ফুটান সম্ভবপর নহে তাহাদের উপর ফুটন্ত গরম জল কয়েকবার ঢালিয়া দিলেও রোগ-জীবাণু কিছু পরিমাণে মরিয়া থাকে।

রাসায়নিক দ্রব্যদ্বারা

নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যদ্বারা রোগ-জীবাণু নষ্ট করা হয়। তাহাদের মধ্যে নিম্নে কয়েকটির বিষয় সংক্ষেপে লিখিত হইল।

কার্ব্বলিক এসিড্ (Carbolic Acid)—জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। উহাতে দুর্গন্ধ কিছু কমে।

পারক্লোরাইড্ অব মার্কারি (Perchloride of Mercury)—ইহা জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। কোন প্রকার ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রে রাখিলে পাত্র ও ঔষধ নষ্ট হয়। কিন্তু বিন্ আইওডাইড্ অব মার্কারি (Bin-iodide of Mercury) রাখিলে পাত্র বা ঔষধ নষ্ট হয় না।

ফর্ম্যালিন (Formalin)—জলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। ইহা দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

আইজল (Izal), লাইজল (Lysol), ডেটল (Dettol)—প্রভৃতি দুর্গন্ধ নষ্ট করে, জীবাণু ধ্বংস করে এবং ময়লা নষ্ট করে।

টিংচার অব আইওডিন (Tincture of Iodine)—ইহা রোগ-জীবাণু নষ্ট করে মাত্র।

বোরিক এসিড্ (Boric Acid)—শরীরের কোমল অংশের রোগ-জীবাণু নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা টিংচার আইওডিন প্রভৃতির মত উগ্র নহে।

সিলভার নাইট্রেট্ (Silver Nitrate)—ইহা রোগ-জীবাণু নাশক। ইহা দ্বারা কাপড়ে দাগ লাগে।

ব্লিচিং পাউডার (Bleaching Powder)—রোগ-জীবাণু নাশের জন্য ইহা জল না মিশাইয়া এবং জল মিশাইয়া উভয় প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

পার্মাঙ্গেনেট্ অব পটাস (Permanganate of Potash)—জলে মিশাইয়া ব্যবহৃত হয়। সাধারণ চূণও অনেক সময় রোগ-জীবাণু নষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্রসমূহ নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে বিশোধিত করিয়া রোগ-বীজাণু শূন্য করা হয়।

কাপড়, জামা—সূতার জামা-কাপড় লাইজলের জলে ভিজাইয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। রেশমী কাপড় জামা আইজলের জলে ধুইতে হয় এবং পশমী কাপড় সোডি-বাই-কার্ব্বমিশান জলে ধুইতে হয়।

বিছানা—বিছানা পোড়াইয়া ফেলিলেই ভাল। নিতান্ত পক্ষে তাহা dry heat-এ অনেক সময় রাখিতে হইবে।

খাট, তক্তপোষ ইত্যাদি—পোড়াইয়া ফেলিলেই ভাল। নিতান্ত পক্ষে লাইজল, পারক্লোরাইড অব মার্কারি প্রভৃতি দ্বারা মুছিয়া পরে পালিশ করিবে।

ঘর-বাড়া—দেয়ালের বালি তুলিয়া ফেলিবে এবং মেঝে খুঁড়িয়া ফেলিবে, তারপর নূতন করিয়া দেওয়াল ও মেঝেতে বালি, সিমেণ্ট দেওয়া, চুণকাম করা বা রং করা উচিত।

বাসন পত্র—থালা, বাসন, বাটী প্রভৃতি গরম জলে পার্মাঙ্গেনেট্ অব পটাশ দ্বারা বহু সময় সিদ্ধ করিতে হইবে।

প্রশ্ন

1. What is the source of cholera microbes? How is cholera spread by flies? (C. U.—1942).
2. Name two most common water-borne diseases which break out in epidemic form. How is water usually polluted? (C. U.—1942.)
3. What is Tuberculosis? How is it spread? How is the spread prevented? (C. U.—1942)
4. Describe the steps that you would take to disinfect a room. (C. U.—1943.)

সপ্তম অধ্যায়

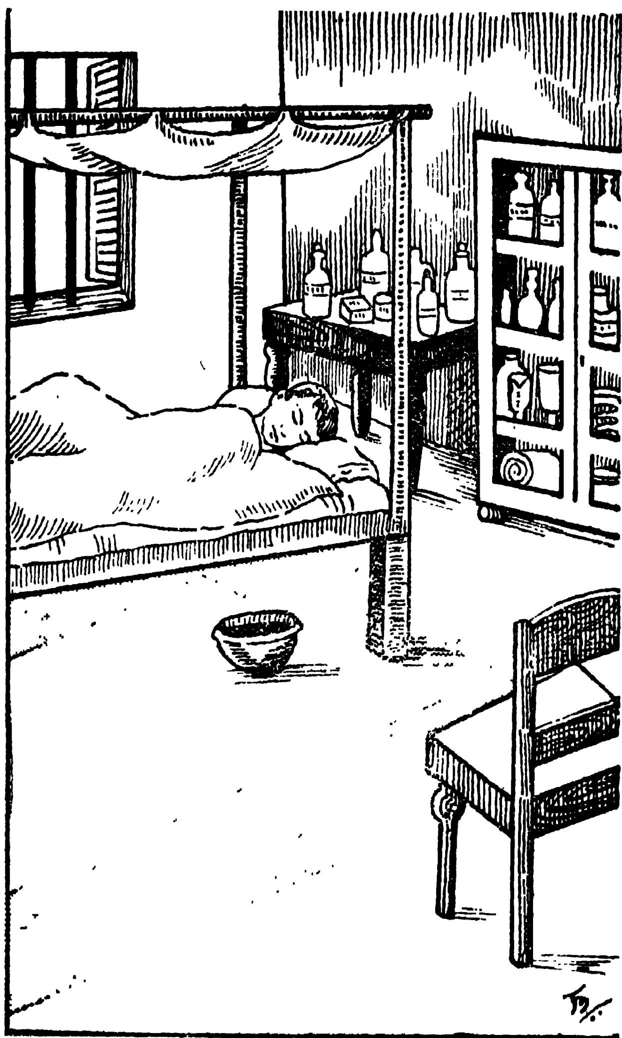
পারিবারিক শুশ্রূষা

সকল পরিবারেই কোন না কোন সময়ে কাহারও না কাহারও অসুখ হইয়া থাকে। রোগ মুক্তির জন্য যেমন চিকিৎসার দরকার, তেমনই সেবা শুশ্রূষারও দরকার। বরং কোন কোন অবস্থাতে ঔষধ অপেক্ষা শুশ্রূষা অধিক দরকারী হইয়া থাকে। সেজন্য সকলেরই রোগীর শুশ্রূষা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ করা উচিত।

রোগীর ঘর

রোগীর উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য সর্ব্বপ্রথমেই তাহাকে পৃথক ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা উচিত। সেজন্য বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঘরখানাই রোগীর জন্য পৃথক করিয়া রাখিলে ভাল। সুস্থ অবস্থায় লোকে যে ভাবে বাস করিতে পারে, অসুস্থ অবস্থায় তাহা অপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা করা গেলেই চিকিৎসার পক্ষে সুবিধা হয়। রোগীর ঘরে প্রচুর আলো ও বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকিবে, সকল দরজা জানালা খোলা থাকিবে এবং সেই ঘরে রোগীর খাট, বিছানা থাকিবে। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রাদি রাখিবার জন্য একখানা ছোট টেবিল ও একজন শুশ্রূষাকারীর বসিবার জন্য চেয়ার বা টুল মাত্র থাকিবে। ঘরে অধিক জিনিষ থাকিলে বায়ু চলাচলের অসুবিধা হয়, ধূলাবালি বেশী জমে,

ঘরের মধ্যে অবাধে চলাফেরার অসুবিধা হয়। রোগীর বিছানা সম্পূর্ণ পৃথক হইবে এবং ঐ বিছানা যাহাতে মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করা যায় সেজন্য দুইটি বিছানা থাকিলে ভাল। অন্ততঃ চাদর, তোয়ালে প্রভৃতি অধিক রাখিতেই হইবে। কারণ সেগুলি প্রতিদিনই পরিবর্ত্তন করিতে হয়। এমন কি রোগীর চাদর তোয়ালে এক দিনের মধ্যেও একাধিক বার পরিবর্ত্তন করা দরকার হয়। রোগীর ঘর সম্বন্ধে আর একটি বিশেষ নিয়ম পালন করা দরকার। অথচ আমাদের বাড়ীতে তাহা সাধারণতঃ মোটেই পালন করা হয় না। অবস্থা বিশেষে রোগীর ঘরে শুশ্রূষাকারী ভিন্ন অন্য লোক যাওয়া নিষিদ্ধ। রোগীর ঘরের জানালা বা দরজায় দাঁড়াইয়াও ভিড় করিতে নাই। অধিক লোক থাকিলে তাহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে রোগীর ঘরের বাতাস বেশী গরম হয়। তাছাড়া তাহাদের কথাবার্ত্তা, চলাফেরাতেও রোগীর উপযুক্ত বিশ্রামের পক্ষে ব্যাঘাত হয়। রোগী কখন কেমন থাকে তাহা ঘরের বাহিরে শুশ্রূষাকারীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাই ভাল। রোগীর ঘরে গিয়া রোগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া বা তাহার সামনেই শুশ্রূষাকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে চেষ্টা না করাই উচিত। অবশ্য দিবসের একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে অন্য লোক অল্প সময়ের জন্য অল্প অল্প করিয়া আসিয়া রোগীকে দেখিয়া যাইতে পারেন বা সামান্য আলাপও (অবস্থা অনুসারে) করিতে পারেন। হাসপাতাল-সমূহে এরূপ ব্যবস্থা করা আছে এবং তাহা রোগীর পক্ষে সত্যই বিশেষ উপকারী।



রোগীর শয়ন-কক্ষ

পৃঃ ১৯৫-১৯৬

রোগীর সেবা

যে কোন লোকই ইচ্ছা করিলে রোগীর সেবা করিতে পারেন—ইহা আমাদের দেশের অনেক লোকের ধারণা এবং সেজন্য রোগীর ঘরে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল লোককেই শুশ্রূষা করিতে দেখা যায়। বাস্তবিক পক্ষে ঐ ধারণা অনেক সময়ই ঠিক নহে। কারণ রোগীর সেবা করিবার জন্য রোগের লক্ষণ, ঔষধপত্র খাওয়াইবার নিয়ম, সেবা করিবার প্রণালী প্রভৃতি ভালরূপে জানা না থাকিলে সেরূপ শুশ্রূষাতে রোগী আরাম পায় না এবং অনেক সময় উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারও হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ইহা বলা যাইতে পারে যে রোগী ঘুমাইয়া থাকিলে তাহাকে ঔষধ বা পথ্য দেওয়া উচিত নহে। তাহার ঘুম ভাঙ্গিলেই তাহা দিবে। তাহাতে একটু দেরী হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু অনভিজ্ঞ কোন লোক শুশ্রূষা করিবার জন্য থাকিলে তিন ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়ার নিয়ম থাকিলে, ঠিক ঘড়ী দেখিয়া রোগীকে ঔষধ দিতে চাহিবে এবং সেজন্য সে হয়ত রোগীর ঘুম ভাঙ্গাইবে। উহাতে রোগীর অশান্তি হইবে এবং ঘুমের ব্যাঘাত হওয়াতে উপকারেরও বাধা হইবে।

সেবাকারীকে সর্ব্বদা হাসিমুখে থাকিতে হইবে। আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে সেজন্যই অধিককাল রোগীর সেবা করা অসুবিধাজনক হয়। কারণ রোগীর অবস্থা উদ্বেগজনক দেখিয়া তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারেন না। অনেক সময়ে রোগীর সম্মুখে অনেকে

ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়াও ফেলেন এবং ঔষধ-পত্র দিতে বা সেবা করিতে কিছু ত্রুটি দেখা যায়। আবার সম্পূর্ণ অপরিচিত বা অনভিজ্ঞ লোককে সেবা করিতে দিলেতাহার মুখে প্রফুল্লতা থাকে না।

শুশ্রূষাকারীর পক্ষে আবার রোগীর আহার, পথ্য, ঔষধপত্র, তাহার মল, মূত্র, থুথু প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের সম্বন্ধে উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করার ও উহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার যোগ্যতা থাকা দরকার। রোগী কখন কখন ঔষধপত্র বা পথ্য গ্রহণ করিতে চাহে না। শুশ্রূষাকারী এ সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। রোগীর থুথু, মল, মূত্র, প্রভৃতিতে রোগের জীবাণু থাকে এবং তাহা বাড়ীর অন্যান্য সুস্থ লোকের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। সুতরাং শুশ্রূষাকারী সেগুলিকে সঙ্গে সঙ্গে পুঁতিয়া ফেলিবেন বা সেগুলির মধ্যেকার জীবাণু নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য ব্যবস্থা করিবে। সর্ব্বদা থুথু ফেলিবার পিকদানী বা ডাবরে ফিনাইল, ডেটল রাখিতে হয়, মলমূত্রাদি ধরিয়া নিজের হাত ফিনাইল ও সাবান দিয়া ধুইয়া ফেলা ইত্যাদি বিষয়ে তাহাকে সতর্ক হইতে হয়।

রোগীর সেবার জন্য সাধারণতঃ যে সকল জিনিষ দরকার তাহাদের ব্যবহার শুশ্রূষাকারীর জানা দরকার। তাহা না জানিলে রোগীর পায়খানা বা প্রস্রাব করিতে কষ্ট হয়, অনেক সময় বার বার বিছানা নষ্ট হয়, মাথা ধুইবার সময় বিছানা, জামা প্রভৃতি ভিজিয়া যায়—ইত্যাদি কত রকম অসুবিধা যে হয় তাহা

বলিয়া শেষ করা যায় না। রোগীর ঘরে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত জিনিষসমূহ রাখা একান্ত দরকার।

ফার্ষ্ট এড্ বাক্স (First Aid Box)—উহাতে ব্যাণ্ডেজ, তূলা, টিনচার আইওডিন প্রভৃতি প্রাথমিক শুশ্রূষার উপযোগী কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ থাকে। অনেক সময় চিকিৎসক আসিবার পূর্ব্বেই রোগীর অবস্থা অনুসারে ঐ সকল জিনিষ ব্যবহার করা দরকার হয়। সেজন্য উহার ব্যবহার শুশ্রূষাকারীর জানা দরকার। বাস্তবিক পক্ষে প্রত্যেক বাড়ীতে সম্ভবপর হইলে ঐরূপ একটি বাক্স রাখা উচিত এবং অন্ততঃ ২।১ জন লোকের পক্ষে উহার ব্যবহার শিক্ষা করা উচিত।

রোগীর চিকিৎসার জন্য—প্রয়োজনীয় ঔষধ, ঔষধ ঢালিবার মেজার গ্লাস, ব্যাণ্ডেজ, তূলা ইত্যাদি রোগীর ঘরে রাখা উচিত।

রোগীর ব্যবহারের জন্য—থুথু, মল, মূত্র প্রভৃতি ফেলিবার জন্য পিকদান, ডাবর, বেড্প্যান, প্রস্রাবের পাত্র, ডুশ, পিচকারী, হটওয়াটার ব্যাগ, আইসব্যাগ, পাখা ইত্যাদি এবং জ্বর দেখিবার জন্য—থার্ম্মোমিটার ও একটি ঘড়ী রোগীর ঘরে রাখা একান্ত দরকার।

বিছানার জন্য কয়েকখানা চাদর, তোয়ালে, দুই সেট বিছানা, অয়েল ক্লথ—তাছাড়া পাউডার, সাবান, এসেন্স প্রভৃতি এবং মেয়েদের চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম, চিরুণী, আয়না প্রভৃতি নানা প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষ ; গরম জল ও ঠাণ্ডা জল রাখিবার ভিন্ন ভিন্ন পাত্র, কুঁজো, গ্লাস ইত্যাদি রোগীর ঘরে থাকা উচিত। এই সকল জিনিষ ছাড়া শুশ্রূষাকারীর জন্য সাবান, গামলা, জল,

তোয়ালে, রোগের অবস্থা লিখিবার জন্য কাগজ, কলম, খাতা প্রভৃতি দরকার।

ঔষধ ও পথ্য

যথানিয়মে রোগীকে ঔষধ ও পথ্য দেওয়া শুশ্রূষাকারীর একটি প্রধান কাজ।

ঔষধ—রোগীর প্রয়োজনীয় ঔষধসমূহ একটি টেবিলে বা তাকে সাজাইয়া রাখা উচিত। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ ঔষধ দেওয়ার পূর্ব্বে তাহা ভালরূপে মিশাইয়া গ্লাস ধুইয়া তাহাতে ঔষধ ঢালিতে হয়। ঔষধ খাওয়াইবার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ধুইবার জল এবং প্রয়োজন হইলে পরে কিছু মুখরোচক জিনিষ দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। কোন কোন রোগীকে ঐরূপ জিনিষ না দিলে সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ বমন করিয়া ফেলিয়া দেয়। ঔষধ দেওয়ার সময়ে যেন কোনরূপ ভুল করিয়া এক ঔষধের জায়গায় অন্য ঔষধ দেওয়া না হয় সে বিষয়ে খুব সাবধান থাকা উচিত। খাওয়াইবার ঔষধের পরিবর্ত্তে মালিশ করিবার বা অন্য কোন কাজে ব্যবহার করিবার ঔষধ দিলে বা এক রোগীকে অন্য রোগীর ঔষধ দিলে উপকারের পরিবর্ত্তে ভীষণ অপকার হইতে পারে। সেজন্য ঔষধ দেওয়ার পূর্ব্বে চিকিৎসকের নিকট হইতে সে বিষয়ে ভালরূপে সকল নির্দ্দেশ জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য।

পথ্য—রোগীর পথ্য সম্বন্ধে ঔষধ অপেক্ষা কম মনোযোগী হইলে চলিবে না। বরং এক্ষেত্রে ঔষধ অপেক্ষা দায়িত্ব ও পরিশ্রম

বেশী। ঔষধ তৈরী অবস্থায় বাড়ীতে আনা হয়, কিন্তু পথ্য বাড়িতেই তৈরী করিতে হয়। সুতরাং রন্ধন ও নানা প্রকার পথ্য তৈয়ার করা সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকিলে বড়ই অসুবিধা হয়। রোগীব পথ্য (সুপ ইত্যাদি হইলেও) সুসিদ্ধ হওয়া দরকার, অথচ তাহাতে তৈল, মসলা প্রভৃতি অধিক দেওয়া বিপজ্জনক। রোগীর পথ্য তৈয়ার করিবার জন্য বাসনপত্র ভালরূপে ধুইয়া লইতে হয় এবং তারপব নির্দ্দিষ্ট মাপের জিনিষ অধিক সময় সিদ্ধ কবিয়া পথ্য তৈয়ার করিতে হয়। বিভিন্ন প্রকার রোগীকে সাধাবণতঃ নিম্নলিখিতরূপ পথ্য দেওয়া হয়।

দুধ—অনেক রোগীকে দুধ পথ্য দেওয়া হয়। সাধারণতঃ গরুর দুধ এবং ছাগলের দুধই পথ্য দেওয়া হয় কোন কোন সময় দুধের সহিত জল, বার্লি, সাগু প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া হয়। ঐ দুধ যাহাতে টাট্‌কা ও বিশুদ্ধ হয় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। রোগীকে কোন সময়েই অপরিষ্কার, বাসি বা অন্যরূপে দূষিত দুধ দেওয়া উচিত নহে।

বার্লি—রোগীর জন্য খুব পাতলা বার্লি তৈয়ার করিবে এবং তাহা খুব ভালরূপে প্রায় ১ ঘণ্টা ফুটাইবে। একবার বার্লি তৈয়ার করিয়া সমস্ত দিন খাওয়ান অত্যন্ত খারাপ। প্রত্যেকবার খাওয়াইবার পূর্ব্বে বার্লি তৈয়ার করা উচিত। অন্ততঃপক্ষে একবারের তৈরী বার্লি ৩ ঘণ্টার পরে আর রোগীকে খাওয়াইবে না। রোগীর জন্য বার্লি খুব টাট্‌কা হওয়া উচিত।

সাগু, এরোরুট—এ সকল জিনিষও খুব বেশী সময় সিদ্ধ করিলে

রোগীর পথ্যরূপে দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল পথ্য তৈয়ার করিবার সময়েও বার্লি তৈয়ার করিবার মত সাবধানতা দরকার।

ছানার জল—টাট্‌কা গরুর দুধে পাতিলেবুর রস, পরিষ্কৃত ছানার জল বা ফিটকিরি দিয়া ছানার জল তৈয়ার করা হয়। পরে ছানা ছাঁকিয়া লইলে যে পরিষ্কার জল থাকে তাহাই রোগীর পথ্য।

ঘোল—বাড়ীতে জমান গরুর দুধের দৈ দিয়া ঘোল তৈয়ার করিয়া রোগীকে দেওয়া যায়। বাজারের দধির তৈরী ঘোল বা কেনা ঘোল ভাল নহে।

ভেজিটেবল সূপ—পটোল, ঢেঁড়স, কাঁচা কলা, মটর শুটি প্রভৃতি টাট্‌কা তরকারীকে খোসাসহ কাটিয়া টুকরা করিয়া সামান্য লবণ, গোলমরিচ প্রভৃতি দিয়া সুসিদ্ধ করিয়া যে ঝোল হয় তাহা রোগীর পথ্য। তরকারীগুলি ছাঁকিয়া পরিষ্কার ঝোলই রোগীকে দিতে হয়।

ডালের সূপ—মসূর, কাঁচা মুগ প্রভৃতি ডাল ভালরূপে ধুইয়া উপরিলিখিত নিয়মে সুসিদ্ধ করিয়া পরে ছাঁকিয়া লইয়া উহা রোগীকে পথ্য দিতে হয়।

এলবুমেন ওয়াটার—ডিমের সাদা অংশ জলের সহিত মিশাইয়া এরূপ খাদ্য তৈয়ার করা হয়। ঐ মিশ্রিত পদার্থ কয়েক মিনিট নাড়িয়া ছাঁকিবার পর চিনি বা লবণ মিশাইয়া রোগীকে পথ্য দিতে হয়।

ভাত—রোগীর জন্য যে ভাত, তরকারী প্রভৃতি পথ্য দেওয়া হয়, তাহাও সাধারণ লোকের খাদ্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। পুরাতন চাউলের সুসিদ্ধ ভাত, টাট্‌কা মাছের ঝোল (মসলা কম দিয়া), ঐরূপ টাট্‌কা তরকারীর ঝোল, দুধ বা দধিই (ঘরেপাতা) রোগীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ অবস্থায় সাধারণ পথ্য।

শুশ্রূষা সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়

শুশ্রূষাকারীর পক্ষে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিত। চিকিৎসক রোগী সম্বন্ধে যে সকল খবর জানিতে চাহিবেন তাহা সম্পূর্ণরূপে জানা তাঁহার একটি প্রধান কাজ। সেই উদ্দেশ্যে শুশ্রূষাকারীকে রোগীর সকল খবর জানিতে হইবে এবং উহা কাগজে লিখিয়া রাখিতে হইবে। কাগজে না লিখিলে তিনি কিছু কিছু বিবরণ হয়ত ভুলিয়া যাইতে পারেন। শুশ্রূষা-কারীকে রোগীর শরীরের উত্তাপ (থার্ম্মমিটারের সাহায্যে) দেখিয়া লিখিতে হইবে, তাহার নাড়ীর গতি বা হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন (সাধারণ সুস্থলোকের প্রতি মিনিটে ৭২ বার স্পন্দন হয়) এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস (সাধারণ অবস্থায় প্রতি মিনিটে সুস্থ লোকের ১৬।১৮ বার), পায়খানা, প্রস্রাব (রং, পরিমাণ ও অন্যান্য বিবরণ), ঘাম প্রভৃতি সকল বিবরণ জানিতে হইবে ও লিখিয়া রাখিতে হইবে। তাছাড়া রোগীকে কখন কি ঔষধ ও পথ্য দেওয়া হইল (পথ্যের পরিমাণ), জল কি

পরিমাণ পান করিল, কখন সেঁক বা প্রলেপ দেওয়া হইল ইত্যাদি সকল বিষয় লিখিয়া রাখিতে হইবে। এই সকল বিষয় ছাড়া পূর্ব্বের সকল ব্যবস্থাপত্র (prescription), ঔষধপত্র, মল, মূত্র প্রভৃতি পরীক্ষার রিপোর্ট ইত্যাদি তাঁহাকে সকলই সাজাইয়া রাখিতে হইবে।

প্রশ্ন

1. What are the duties of a Nurse ? (C. U.—1942).
2. Draw up a list of the articles that you should keep handy for rendering 'First Aid' in your home. (C. U.—1943).
3. State how you would prepare any two of the following invalid diets :—

(a) Milk jelly, (b) whey (chanar jal), (c) egg, milk and brandy, (d) meat broth and (e) vegetable soup. (C. U.—1944).